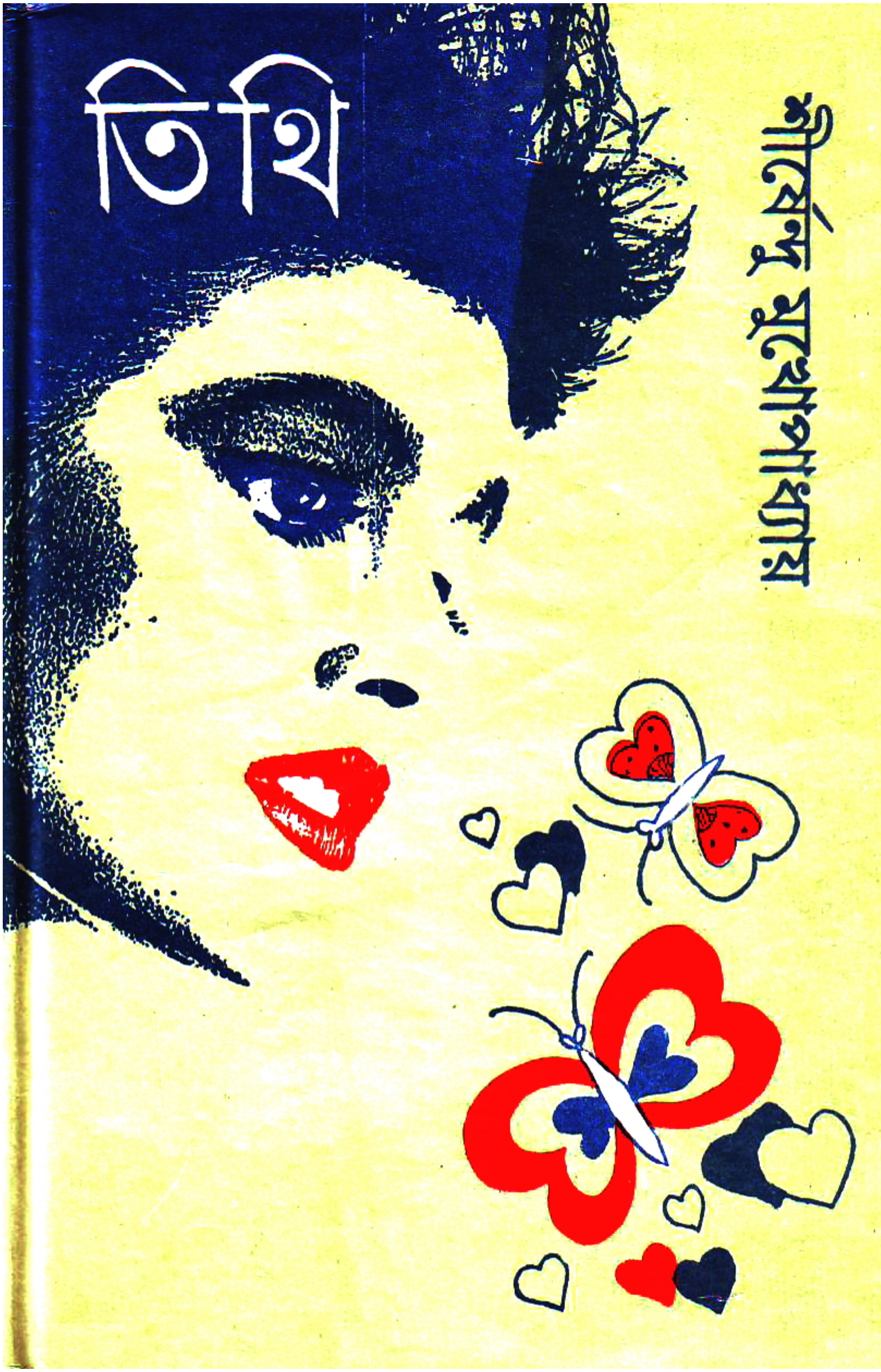
তিথি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

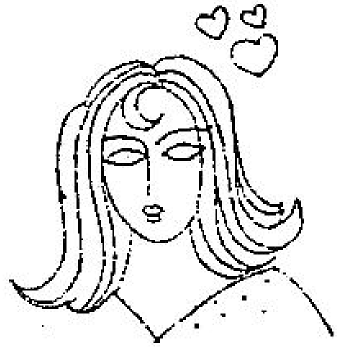

॥ ১ ॥

তিথির বয়স চৌদ্দ প্লাস। বাইরে এখন ফুটফুটে ভোর। তাদের লবণহ্রদের বাড়ির বাগানে এখন অসময়ে কেন যে একটা কোকিল ডাকছে। আর একটা বাতাস—খুব অদ্ভুত ভুতুড়ে বাতাস হুহু করে বয়ে যাচ্ছে। ঠিক মনে হয়, বাতাসের কিছু কথা আছে, বলতে চাইছে, কিন্তু বোঝাতে পারছে না।

তিথি এই ভোরবেলাটিকে টের পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে কোকিলের ডাক। বাতাসের ঝাপটায় তার ববকাট চুল উড়ছে, ঝাপটা মারছে। কিন্তু তিথির সমস্ত মনপ্রাণ নিবদ্ধ একটা প্যাডের কাগজে লেখা কয়েক লাইন চিঠিতে। ঠিক চিঠিও নয়। তার বাবা বিপ্লব দত্ত বাংলা ভাল জানত না, লিখতে গেলে অজস্র বানান ভুল করত, তাই পারতপক্ষে বাংলা ব্যবহার করত না। একটু বেশি কোনাচে অক্ষর এবং ডানদিকে খুব বেশি হেলানো একধরনের ছাঁদ ছিল তার বাবার। এই হাতের লেখা চিনতে কোনও অসুবিধেই নেই তিথির। ওপরে খুব আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা—"টু হুম ইট মে কনসার্ন"। তার নিচে সেই মারাত্মক কয়েকটি লাইন—"নো বডি—অ্যাবসোলিউটলি নো বডি ইজ রেসপনসিবল ফর মাই ডেথ। লাইফ ওয়াজ অল ফান, ইট ইজ ফানিয়ার টু টেক ইট অ্যাওয়ে। আই লিভড ওয়েল, কন্টেন্টেড। ডোন্ট বদার মাই

ফ্যামিলি। বাই। বিপ্লব দত্ত।" বাবার ইংরিজি সই খুব ভাল চেনে তিথি। পরিষ্কার সই, কোনও অস্পষ্টতা নেই, ঠিক যে ধরনের মানুষ ছিল তার বাবা। স্পষ্ট মানুষ। তবু কেন যে কেউ ঠিকমতো বুঝতে পারেনি লোকটাকে।

বিপ্লব দত্ত মারা গেছে মাস দুয়েক আগে। তখন কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশ কিছু ঝামেলা পাকিয়ে তুলেছিল। সোমনাথমামা এবং তার প্রভাবশালী বন্ধুরা লালবাজারকে নাড়া দিয়ে তবেই মৃতদেহ পুলিশ হেফাজত থেকে উদ্ধার করে আনে।

তিথি ভোরের ফুটফুটে আলোয়, কোকিলের ডাক আর বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে তার বাবার সুইসাইড নোটটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল। কপালের ওপর চুলের ঝটকা নেমে আসছে মাঝে মাঝে। সে কি বাবার ঈষৎ ভগ্ন কিন্তু গভীর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছে?—লাইফ ওয়াজ অল ফান, ইট ইজ ফানিয়ার টু টেক ইট অ্যাওয়ে।....বাই।

এলিয়টের ওল্ড পোসামস্ বুক অফ প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস বইটা এই ভোরে খুঁজে বের করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না তিথির। কবিতা সে পড়েও না। দুমাস বাদে আজই আবার ভোর রাত থেকে সে শুরু করেছিল তার ফিজিক্যাল ওয়ার্ক আউট। প্রতিদিন সে অন্তত দু তিন মাইল দৌড়োয়। এক মাস বিরতির পর অবশ্য অর্ধেকও পারল না। উরু আর পায়ের ডিম ব্যথায় অবশ করে আনল। সঙ্গে একটা ক্লান্তি, হতাশা, ঘাম, বিরক্তি। মনে হচ্ছিল বৃথা শ্রম। বারান্দায় স্কিপিং করতে করতে মনে হচ্ছিল, বাঁদরের মতো লাফাচ্ছি কেন? কী হবে এই সব করে? ঘরে এসে পাখাটা খুলে মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিল তিথি। গরম লাগছিল ভীষণ তাই মেঝের ঠান্ডাটা বড় ভাল লাগছিল তার। মেঝেয় শুয়েছিল বলেই দেখতে পেল, বুক কেসের একদম নিচের তাকে একখানা বই উল্টো করে রাখা। তিথি গোছানো মেয়ে, উল্টোপাল্টা পছন্দ করে না। মেঝের ওপরই

গড়িয়ে গিয়ে সে বুক কেস খুলে বইটা সোজা করে রাখতে গিয়ে দেখল, একটা সাদা কাগজের কোনা উঁচু হয়ে আছে। টেনে বের করতেই তার চোখ স্থির হয়ে গেল।

এই আবিষ্কারের এখন আর কোনও মূল্য নেই। তার বাবার শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে কবে। তবু তিথির যেন মনে হচ্ছিল, সে তার বাবাকে স্পষ্টভাবে টের পাচ্ছে। বাবা যেন কাছেই! পাশেই!

এ-বাড়ির প্রায় সবাই নাস্তিক। কিংবা নাস্তিকও বলা যায় না, একটু হচপচ। ভগবান টগবান নিয়ে কেউ কিছু ভাবে-টাবে না। ভূত-টূত ইত্যাদি নিয়েও তারা কখনও মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়, বিপ্লব দত্ত মারা যাওয়ার পরই এই বাড়ির আবহাওয়ায় কিছু একটা সঞ্চারিত হল। কেমন থম ধরে গেল চারদিকটা! একটা ঘোর-ঘোর ভাব ঘনিয়ে উঠল কি বাড়ির ভিতরে?

প্রথম দু-চারদিন কেউ কিছু বলল না। কান্নাকাটি, শোক, আত্মীয়-সমাগম ইত্যাদির পর সঞ্চারি একদিন ব্রেকফাস্টের সময় বলল, কাল রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি, অ্যান্ড আই হার্ড সামবডি ওয়াকিং অন দা রুফ।

আশ্চর্যের বিষয় কেউ এই কথার প্রতিবাদ করল না। সবাই চুপ করে রইল।

বিকেলে বুম্বা বলল, তোমাকে বলিনি মা, অাই হিয়ার সামবডি কাফিং অ্যাট মিডনাইট।

তিথির মা মিলি দত্ত কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে বলল, ওসব কিছু নয়।

এর বেশি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মিলি দিতে চেষ্টা করল না।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল বাসন্তীর। সে এ-বাড়ির সবসময়ের কাজের লোক। সুন্দরবনের এই বাইশ-তেইশ বছর বয়সের যুবতীটি বেশ স্পষ্ট ভাষায় একদিন বলল, ও বউদি, দাদাবাবু কিন্তু এখনও আছে। কাল দেখলুম দোতলার বারান্দায়

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কে সিগারেট খাচ্ছে যেন। তখন রাত দুটো আড়াইটে হবে।

মিলি খুবই দুর্বল গলায় বলল, বাসন্তী, এ-বাড়িতে বাচ্চারা রয়েছে। ওসব কখনও বলবে না। তোমরা গাঁয়ের লোক, অনেক কিছুই বিশ্বাস করো. আমরা করি না।

বাসন্তী আর উচ্চবাচ্য করল না তখনকার মতো। কিন্তু তারপর থেকে সে অন্য কৌশল নিল। কাজ করতে করতে সে স্বগতোক্তির মতো বলে যেতে লাগল, এসব অশৈলী কাণ্ড····এই তো স্পষ্ট শুনলুম দুপুরবেলা দাদাবাবুর ঘর থেকে খুটখাট শব্দ আসছে····আচ্ছা, মলিন তো আর কালা নয়, সেও তো রাতে উঠে বাইরে যেতে গিয়ে দেখেছে ছাদের ওপর থেকে ঝুঁকে কে চেয়ে আছে বাগানের দিকে····অপঘাত বলে কথা····

এমন কি বাসন্তী কাজ ছেড়ে দেওয়ার হুমকি অবধি দিয়েছে মাঝে মাঝে।

এ-বাড়িতে কেউ ভূতে বিশ্বাস করত না বা এখনও করে না। কিন্তু বিপ্লব দত্ত মারা যাওয়ার পর সকলেই একে একে কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে এবং নানা অমোঘ অজুহাতে ঘর বদল করে ফেলল। বুক্কা চলে এল মায়ের ঘরে। হলঘরে বাসন্তী মেঝেতে আর সঞ্চারি সোফা কাম বেডে শুতে লাগল।

তিথিও ঘর বদলাল। তবে সেটা প্রতিবাদ হিসেবে। মৃত বাবাকে তার কোনও ভয় নেই। নিজের ঘর ছেড়ে সে চলে এল একতলায় তার বাবার ঘরে—যে ঘরে তার বাবা আত্মহত্যা করেছে।

মিলি রাগ করে বলল, এসব কী হচ্ছে তিথি? মোটেই ভাল নয়। আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মানুষের মনের ইম্‌প্রেশন তার চারদিকের অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারে থেকে যায়। তোমার নিজের দক্ষিণ খোলা ঘর থাকতে ও ঘরে যাচ্ছো কেন?

তিথি উত্তর দেয়নি। কিন্তু মায়ের কথাও শোনেনি।

গত দু মাস তিথি এ ঘরে আছে। একা। বাবার খাটে শোয়। বাবার টেবিলে লেখাপড়া করে। গভীর রাত অবধি জেগে থেকে ভাবে। জন্মের কথা। মৃত্যুর কথা।

সে পায়ের শব্দ বা কাশির আওয়াজ শোনেনি। সিগারেটের গন্ধ পায়নি। দেখেওনি কোনও ছায়ামূর্তিকে। গভীর রাতে সবাই ঘুমোলে ঘুমহীন তিথি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছে ভূতের মতো। ছাদে, বারান্দায়, ঘরে ঘরে।

কিন্তু আজ সকালে বিপ্লব দত্তর সুইসাইড নোটটার দিকে চেয়ে থেকে তার মনে হল, বাবা যেন খুব কাছে। আর এই যে ভূতুড়ে বাতাস আর কোকিলের ডাক এর ভিতর দিয়ে তার বাবাই যেন কিছু বলতে চাইছে তাকে।

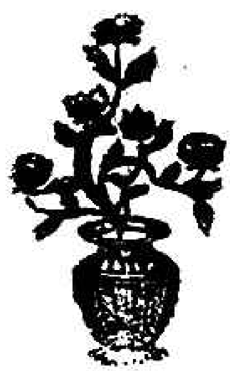

॥ ২ ॥

বিপ্লব দত্ত মারা যাওয়ার পর কোনও সুইসাইড নোট আছে কিনা তা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। পাওয়া যায়নি। সোমনাথমামা শেষ অবধি বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিল, হি ওয়াজ এ ভেরি ইররেসপনসিবল গাই। নিজের ফ্যামিলি হ্যারাস্ড হোক এটাই কি চেয়েছিলেন উনি? কোনও ভদ্রলোক তা চায়?

বিরক্ত মিলি দত্তও হয়েছিল। তবে সেটা প্রকাশ করেনি।

কেন নোটটা তখন পাওয়া যায়নি তা ধীরে ধীরে আজ সকালে বুঝতে পারল তিথি। বাবা সব সময় একগাদা বই নিয়ে শুতে যেত রাতে। অনেক রাত অবধি পড়ত। ঘুম পেলে বেডসুইচ টিপে ঘুমিয়ে পড়ত। সকালবেলায় বিছানা থেকে বইগুলো সরিয়ে আবার বুক কেসে ভরত ঠিকে কাজের মেয়ে একা—অর্থাৎ একাদশী। সেদিনও তাই করেছিল। একা তো আর জানত না বিপ্লব দত্ত কবিতার বইতে তার সুইসাইড নোট গুঁজে রেখে গেছে। সে যখন বিপ্লব দত্তর বিছানা থেকে বই সরায় তখন লোকটি যে মারা গেছে একথাও তার জানা ছিল না। বিপ্লব দত্ত রোজকার মতোই কাত হয়ে পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে

ছিল। প্রায় তিন দিন ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টির পর সেদিনই পরিষ্কার আকাশে ভোরের রোদ দেখা দিয়েছিল। চমৎকার ছিল আবহাওয়া। সেদিন খবরের কাগজে খুন জখম দুর্ঘটনার খবর ছিল খুবই কম। সেদিন একটি বিরল দোয়েল শিস শুনিয়ে গিয়েছিল। শিউলি গাছে শরতের প্রথম ফুল সেদিনই দেখেছিল প্রথম সপ্তর্ষি, মা, দেখে যাও শিউলি ফুল!

বাবাহীন পৃথিবীতে দুই মাস কেটে গেল। কাটবে বলে বিশ্বাস ছিল না তিথির। নোটটা হাতে নিয়ে তিথি খুব ধীর পায়ে বারান্দায় আরও আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল। বাঁকা জোরালো হাতের লেখা সুইসাইড নোটটার দিকে তাকিয়ে থেকেই সে শুনতে পেল, বাগানের ফুলে ফুলে মৌমাছির শব্দ। গ্যারেজের ওপাশে রাজমিস্ত্রিরা একটা ঘর করেছিল টিনের। ঘরটা ভাঙা হয়নি আজও। অনেক অব্যবহৃত জিনিস পড়ে আছে। সেই ঘরে মৌমাছি চাক বেঁধেছে। বিপ্লব দত্ত রোজ ওই চাকটা দেখে আসত গিয়ে। নরম রোদে দাঁড়িয়ে তিথি একটু ভাবল। মরবার আগে বাবার কি মনে হয়নি যে, তার তিথি খুব কাঁদবে? তিথির বড্ড কষ্ট হবে? একটুও ভাবল না বাবা?

কোকিলটা যখন তার আর এক দফা ডাক শুরু করল তখন তিথি টের পেল, সে কাঁদছে।

চোখের জল মুছে দোতলায় উঠে এল তিথি। চায়ের গন্ধ, রুটি সেঁকার গন্ধ, বাসনমাজার শব্দ।

মিলি দত্ত ডাইনিং টেবিলে বসা। সামনে চা।

তিথি মায়ের সামনে কাগজটা রেখে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, এই নাও মা, বাবার সুইসাইড নোট।

মিলি খুব অবাক হয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, কী এটা! কী বললি?

—বাবার সুইসাইড নোট। পড়ো না।

হাতটা একটু কেঁপে গেল কিনা বোঝা গেল না। মিলি দত্ত

কাগজের ভাঁজটা খুলতে একটু সময় নিল। লেখাটা পড়তে প্রয়োজনের চেয়ে সময় আরও অনেকটা বেশি লাগল। তারপর উৎকণ্ঠ গলায় বলল, এই তো! কোথায় ছিল এটা? কোথায় পেলি?

—একটা বইয়ের মধ্যে। একা ওটা বুক কেসে তুলে রেখেছিল।

মিলি দত্ত সভয়ে, আতঙ্কের সঙ্গে বিপ্লব দত্তের জোরালো হাতের কয়েকটি লাইনের দিকে চেয়ে থেকে অসহায় মুখখানা তুলে তিথিকে যখন বলল, "এখন এটা দিয়ে আমরা কী করব?" ঠিক তখনই তিথি অনেকদিন বাদে হঠাৎ আবার টের পেল, তার মা কী অসম্ভব সুন্দরী! ছোটোখাটো, ক্ষীণাঙ্গী এই মহিলাকে এখন মনে হচ্ছে যেন দেবযান থেকে পড়া কোনও অপ্সরা। হ্যাঁ অপ্সরা, দেবী নয়। মিলি দত্তের চেহারায় দেবী-দেবী ভাব নেই। তার সৌন্দর্যে ঝাঁজ আছে, আছে আক্রমণ।

তিথি কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল, এটা আমার কাছে থাকুক মা। তুমি চা-টা খাও।

সব মহিলারই স্বামী সম্পর্কে কিছু অভিযোগ থাকে। মিলি দত্তেরও ছিল এবং আছে। তিথি জানে তার বাবা শুধু বাবা হিসেবে ছিল দারুণ। টপ গ্রেড। কিন্তু স্বামী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, আত্মীয় হিসেবে, মনিব হিসেবে, কর্মচারী হিসেবে অন্যান্য মানুষের কাছে হয়তো ততটা ভাল ছিল না।

যাকে আদ্যন্ত অসহায় বলে মিলি দত্ত ঠিক তাই। মিলি দত্ত একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কোনও কিছু নির্ধারণ করতে পারে না, কোন মানুষ কেমন তা বিচার করতে পারে না, কোন দিন কী রান্না হবে তা ঠিক করতে পারে না, মিলি দত্ত ভি সি আর বা স্টিরিও চালাতে পারে না, মিলি দত্তের এই সব খামতিকে কোনওদিন নেগেটিভ সাইড বলে ভাবে না তিথি! কে জানে হয়তো এগুলোরও কিছু প্লাস পয়েন্ট থাকতে পারে।

মিলি মেয়ের দিকে চেয়ে ছিল প্রায় অপলক চোখে। স্বামী আত্মহত্যা করলে, সন্তানেরা কি ভাবে বাবার মৃত্যুর পিছনে মায়ের গঞ্জনা

আছে? মিলি দত্ত আজকাল ছেলেমেয়েদের দিকে যেরকম ভয়ে ভরা চোখ নিয়ে তাকায় তাকে ইংরিজিতে বলে শাঁপিশ।

তিথির পরনে এখনও ছাইরঙা ট্র্যাক স্যুট, পায়ে কেডস। আজ এগুলো ছাড়ার কথা খেয়ালই হয়নি তার।

—চিঠিটার কথা কি আমাদের কাউকে বলা দরকার?

তিথি ভ্রূ কুঁচকে বলল, না। এ চিঠিটার আর কোনও মূল্য নেই। এটা আমার কাছেই থাকবে।

—কী দরকার ওসব রেখে? ওটা কি ভাল চিঠি?

তিথি মাথা নেড়ে বলল, ভাল খারাপ কিছু নয়। থাক না।

—আমার কেমন যেন ভয় করছিল চিঠিটা পড়তে। কী সব লিখেছে। কেমন মানুষ ছিল তোর বাবা?

বাইশ বছর ঘর করার পর স্বামী সম্পর্কে এরকম অকপট প্রশ্ন একমাত্র মিলিই করতে পারে।

তিথি বলল, মাই ড্যাড ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক।

মিলি চা খেল। খুব ধীরে ধীরে।

—তুই আবার আজ থেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলি?

—হ্যাঁ মা।

—ওসব করলে তোর চেহারাটা বড্ড রুক্ষ হয়ে যায়।

—তা যায়। তাতে কী?

মিলি মাঝে মাঝে ভ্রূ কোঁচকায়। ওটা ওর মুদ্রাদোষ। এখনও কোঁচকাল। বাইরের ঘরে দেয়ালজোড়া মস্ত এক শো-কেস। মিলির চোখ এখন সেই দিকে।

শো-কেসে দেখার কিছু নেই। কোথাও দেখার তেমন কিছু নেই। মানুষ তাই স্মৃতির মধ্যে ডুবে অতীতকে দেখতে থাকে। অতীত তার চারদিকে মিলেমিশে একাকার এক সময়হীন উল্টোপাল্টা ছবি বিছিয়ে দেয়।

মিলিকে এই অবস্থায় রেখে তিথি চলে এল নিচে। বাথরুমে

গাঁজার চালু করল। হট অ্যান্ড কোল্ড শাওয়ার তার খুব প্রিয়। তারপর পোশাক না ছেড়েই সে বাবার ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আনমনে। দেখার কিছুই নেই এবং বহুবার দেখা। তবু গত একমাস ধরে এ ঘরের নানা জিনিসে সে বাবাকে অনুভব করছে। এ ঘরে বাবার কোনও ছবি নেই। বিপ্লব দত্ত ফটো তোলাতে ভালবাসত না। আরও অপছন্দ করত ফটোর ডিসপ্লে। বাবাকে মনে করার জন্যে অবশ্য তিথির কোনও ফটোগ্রাফ দরকার নেই।

দুটো বুক কেস, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা ডিভান, ছোটো হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং স্টিলের একখানা চেয়ার। মোটামুটি এই হল আসবাব। বিপ্লব দত্তের ডায়েরি লেখার কোনও অভ্যাস ছিল না। কিন্তু কয়েকটা ডায়েরি খুঁজে পেয়েছে তিথি। সেগুলির বেশির ভাগের মধ্যেই কিছু লেখা নেই। দু একটা পাতায় কিছু মন্তব্য আছে। যেমন দু বছর আগে একদিন তার বাবা লিখেছিল, ওঃ ইটস গোয়িং টু বি অ্যান অফুল ডে। গড। আর একটাতে ছিল, আননোন। আর একটাতে ছিল, অ্যাভিডউ স্মোকিং।

সিগারেট ছাড়তে বিপ্লব দত্তের খুবই কষ্ট হয়েছিল, এটা বেশ মনে আছে তিথির। লবঙ্গ চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলত আর ঝালের চোটে উঃ আঃ করত।

লোকটাকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মরবেই যদি তাহলে সিগারেট ছাড়লে কেন? তোমার কেন কোনও লাইফ প্ল্যানিং ছিল না?

স্নানের আগে কিছুক্ষণ যোগব্যায়াম। তিথি যন্ত্রের মতো তার আসনগুলো করে গেল। স্নান করল। পোশাক পরল। জিনস আর কামিজ।

সিঁড়িতে প্রবল পায়ের শব্দ তুলে তিথির ঘরে এসে হামলে পড়ল দুজন। বুক্কা আর সম্পারি।

বুক্কা বলল, বাবার সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে?

তিথি গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ।

—দেখাবি ?

তিথি বের করে দিল।

বুক্কা তাদের তিন ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত। একটু মোটাসোটা। খুব খেতে ভালবাসে। বুক্কার সঙ্গে বাবার একটু আড়া-আড়ি ছিল বরাবর। বুক্কা বাবার ছেলের চেয়েও বেশি মায়ের ছেলে। বুক্কার ভুবনজোড়া মা। এখনও সে মায়ের কোল ঘেঁষে শোয়। এখনও বায়না করে। বাবাকে ভয় পেত, একটু এড়িয়ে চলত।

সঞ্চারি আর তিথি দুই বোন। সঞ্চারি বড়, তিথি ছোটো। তিথি সকলের ছোটো। কিন্তু সঞ্চারির সঙ্গে তিথির কোনও মিল নেই। সঞ্চারি গৌর বর্ণের, তিথির রঙ মাজা। সঞ্চারি ঢলঢলে, তিথির চেহারা একটু রুক্ষ আর কেঠো। মনের মিলও দুজনের বিশেষ নেই।

এ-বাড়ির কার সঙ্গেই বা তিথির মনের মিল ? আজকাল তিথি কারও সঙ্গে তেমন কথাই বলে না।

সঞ্চারি বুক্কার হাত থেকে নোটটা নিয়ে ভ্রু কুঁচকে দেখল। বলল, এর মানে কী ?

তিথি বলল, তুই বুঝবি না।

—তুই বুঝেছিস ?

তিথি সঞ্চারির দিকে এক ঝলক তাকাল। সে চোখে তাচ্ছিল্য। কথাটার জবাব দেওয়ার মানেই হয় না।

যদিও সঞ্চারি তিথির চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তবু সে তিথিকে সমঝে চলে। একটু ভয়ও খায়। ভয় খায় বুক্কাও, দু বছরের বড়, দখলদার এবং মাতব্বরি করার অধিকারসম্পন্ন দাদা হওয়া সত্ত্বেও। তিথি কারও সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করে না, তর্কে যায় না, বেশি কথাও কয় না। তবু তিথিকে সবাই একটু এড়িয়ে চলতে চায়। চোখে চোখ রাখে না। তার মতামতকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুত্ব দেয়। তিথি জানে।

বুক্কা চেয়ারে বসল, সঞ্চারি আর তিথি বিছানায়। বিপ্লব দত্তের মৃত্যুজনিত শোক এ বাড়ি থেকে একরকম বিদায় নিয়েছে। যা আছে তা একটু শূন্যতামাত্র। সময়ের প্রলেপ সেই ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবে।

সুইসাইড নোটটা বুক্কা টেবিলের ওপর আলগা রেখেছিল। চাপা দেয়নি। বাতাসে সেটা পাল্টি খেয়ে উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বুক্কাই সেটা ধরে ফেলল।

সঞ্চারি দু হাঁটু তুলে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে বসা, জোড়া হাঁটুর ওপর তার থুতনি। বুক্কা বসেছে চেয়ারে হেলান দিয়ে, এলিয়ে, দু পা সামনে ছড়িয়ে। তিথি পা মেঝেয় রেখে বিছানায় বসেছে সোজা হয়ে, যেন বা সে এ-বাড়ির লোক নয়, অভ্যাগত মাত্র, এখনই চলে যাবে।

সঞ্চারি এক দৃষ্টিতে তিথির দিকে চেয়ে ছিল। বলল, বাবা যে লিখেছে—লাইফ ওয়াজ অল ফান, ইট ইজ ফানিয়ার টু টেক ইট অ্যাওয়ে—একথা কেন লিখল বল তো! বেঁচে থাকাটা না হয় ফান বোঝা গেল, কিন্তু মরাটা কি আরও মজার?

বুক্কা মাথা নেড়ে বলল, বাবা মোটেই মজা করার লোক ছিল না। ওরকম সিরিয়াস লোকের কাছে জীবনটা কখনোই ফান হতে পারে না। আমার কাছে বাবার এই সুইসাইড নোটটা খুব অদ্ভুত লাগছে। যেন এটা বাবার লেখাই নয়।

সঞ্চারি বিরক্ত হয়ে বল্লে, বাবার নয় তো কার লেখা? বাবার হাতের লেখা চিনিস না!

—চিনি। বাবারই লেখা। তবু মনে হচ্ছে এটা লিখবার সময় বাবা ঠিক বাবার মতো ছিল না। কিছু একটা ভর করেছিল বাবার ওপর।

সঞ্চারি তার ভ্রূ তুলে বলে, ভর! ভর মানে?

—হি ওয়াজ পজেজ্‌ড বাই সামথিং।

—সেই সামথিংটা কী?

—আমি কী করে বলব? লেট আস ইনভেস্টিগেট। আমার মনে হয় তিথি বলতে পারে। শী ওয়াজ ক্লোজ টু হিম।

তিথির মুখ প্রতিদিনই সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে। আজ আরও গম্ভীর। সে দাদা বা দিদির বেশির ভাগ কথারই জবাব দেয় না। বুকার এ কথারও জবাব দিল না। তবে তার মনে হল, কথাটা বুক্কা খুব মিথ্যে বলছে না। বাবার কাছে জীবনটা খুব মজার ছিল বলে তার তো মনে হয়নি কখনও। ই এম এস-এর ইনজিনিয়ার ছিল বিপ্লব দত্ত। একটু মিলিটারি ধাঁচ ছিল স্বভাবে। রিটায়ারমেন্টের অনেক আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লব দত্ত কনসালটেন্সি খুলেছিল। তারপর থেকেই যেন আরও গুটিয়ে যাচ্ছিল নিজের মধ্যে। আর এই যে সংসারের সকলকে পাশ কাটিয়ে নিচের ঘরে একা ভূতগ্রস্তের মতো থাকা এটাও তার মজাদার জীবনের লক্ষণ তো নয়।

বুক্কা তিথির দিকে চেয়ে বলল, তুই এ ঘরে কি করে একা থাকিস বল তো তিথি. ইউ মাস্ট বি এ ভেরি ব্রেভ গার্ল। আমি তো সব সময়ে ফিল করি দেয়ার ইজ সাম স্পিরিট অর সামথিং ইন দিস হাউস।

সঞ্চারি ভাইয়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বিরক্ত গলায় বলে, আবার ওসব কথা! বলেছি না ওটা সাইকোলজিক্যাল! কেউ মারা গেলে কিছুদিন ওরকম ফিলিং হয়।

বুক্কা মাথা নেড়ে বলে. মোটেই নয়। আই হিয়ার থিংস, আই সি থিংস।

তিথি সামান্য একটু হাসল। ইস্পাতের মতো হাসি। এ বাড়ির সকলের কাছেই বাবা এখন ভূত! সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, তুই কি বাবার ভূতকে দেখেছিস?

বুক্কা একটু অস্বস্তিতে পড়ে বলে, ঠিক তা নয়। কিন্তু সামথিং। ঠিক বোঝানো যায় না। আজকাল মাঝে মাঝে আমার অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায়। তখন আই ফিল সামথিং। মনে হয় মশারির বাইরে কে যেন এসে দাঁড়িয়ে আমাকে একদৃষ্টে দেখছে। আমি বাথরুমে শব্দ শুনতে পাই, কে যেন বেসিনে মুখ ধুচ্ছে বা ফ্ল্যাশ টানল। অথচ কেউ ওঠেনি অত রাতে।

তিথি দৃঢ়স্বরে বলে, বাবা তো দোতলার বাথরুম ব্যবহারই করত না। বাবা থাকত এ ঘরে, নিচে।

বুব্বা অসহায় গলায় বলে, সেটা কোনও যুক্তি নয়। আই ফিল এ ভেরি মিস্টিরিয়াস প্রেজেন্স অফ সামবডি।

সম্প্রারি ধমকের স্বরে বলে, তোর সামবডি আর সামথিং নিয়ে তুই থাক গে। বুদ্ধু কোথাকার!

—তুইও তো ভয় পাস দিদি, বেশি বাহাদুরি দেখাতে হবে না। ব্রেভ হল তিথি। রিয়াল ব্রেভ।

—আমি মোটেই পাই ভয় না। বাসন্তী ভয় পায় বলেই আমার কাছে এসে শোয়।

—তুই তো মাকেই বলেছিস যে তুইও ওরকম কিছু ফিল করিস আজকাল।

সম্প্রারি চোখ পাকিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, তিথি উঠে পড়ে বলল, তোরা যদি ঝগড়া করিস তাহলে বরং আমি যাই।

বুব্বা সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গিয়ে বলে, ঝগড়া করছি না। এনিওয়ে বাবা, আমি স্বীকার করছি যে আমি ভীতু ছেলে। বাবার এই নোটটা পড়ে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবা শেষ সময়টায় খুব মজা পেয়েছিল। মরবার আগে খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিল নিশ্চয়ই।

সম্প্রারি চাপা গলায় বলল, ইডিয়ট। গাধা।

বুব্বা তিথির দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলে তাই মনে হচ্ছে না রে তিথি? তুই-ই বল

তিথি মৃদু স্বরে বলল, সে কথা বাবা ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

বুব্বা তিথির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তুই একটা কথা সত্যি করে বলবি?

—কী কথা

—আমার মনে হয় বাবার ইনসিডেন্টটা সম্পর্কে একমাত্র তুই সব

জানিস।

—আমি! আমি কী করে জানব?

—বাবা তোকে খুব ভালবাসত, তুইও বাবাকে।

—তাতে কী?

—বাবা মরবার পর তোকে এসে সব বলে যায়।

—তার মানে?

বুক্কা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, বাবার গোস্ট এ-বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় কাউকে কিছু বলতে চায়। আর তুই এ ঘরে—ইন দি রুম দি ইনসিডেন্ট টুক প্লেস—একা থাকিস। আমার মনে হয় বাবা তোকে এসে সব বলে যায়।

সণ্ডারি চাবুকের মতো গলায় বলে, শাট আপ!

বুক্কা নির্বিকার মুখে বলে, তুই কী বলিস তিথি?

তিথি খুব উদাস মুখ করে বলে, বাবার আত্মা আমার কাছে কখনও আসেনি। ওসব আমি বিশ্বাস করি না।

—তাহলে তুই এ ঘরে একা থাকিস কেন?

—এমনি।

—কিছু ফিল করিস না? কিছুই না?

—ফিল করি। বাবাকেই ফিল করি। তবে সেটা ভূতকে নয়, লোকটাকেই।

—তার মানে?

—বাবার ক্যারেকটার, বাবার ইমপ্রেশন এ ঘরে ছড়িয়ে আছে। অ্যাটমস্ফিয়ার কিছু ক্যারি করে। আমি সেটাকেই ফিল করি। বাবার বিছানায় ঘুমোই, বাবার টেবিলে বসে লেখাপড়া করি, বাবার জিনিসপত্র ছুঁই, আর এভাবে বাবাকে ফিল করি। তার বেশি কিছু নয়।

—তুই ব্রেভ। দারুণ ব্রেভ।

সণ্ডারি ঈর্ষার চোখে তিথির দিকে চেয়ে ছিল। তিথি যে দারুণ সাহসী তাতে সন্দেহ নেই। এত সাহস তার নেই, এ-বাড়ির কারও

নেই। হঠাৎ সণ্টারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের যে কী হবে!

বুক্কা তেমনি গা ছেড়ে বসে খুব নির্বিকার গলায় বলে, কী আর হবে। উই হ্যাভ বিকাম রিয়েল পুওর। দিদির বিয়ে হওয়ার চান্স নেই, আমার হায়ার এডুকেশন হবে না. তিথির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তিথি একটু অবাক হয়ে বলে কী সব বলছিস?

বুক্কা তেমনি উদাস গলায় বলে. হুঁহুঁ বাবা, সব জানি। মার সঙ্গে মামার রোজ এসব নিয়ে জোর ডিসকাশন হচ্ছে। দেয়ার ইজ নাথিং লেফট। বাবার ব্যাঙ্কে তেমন টাকা ছিল না, ইনসিওরেন্স পলিসি যা আছে তা সামান্য টাকার। কোম্পানির কাগজটাগজও কিছু নেই। অলমোস্ট ব্যাঙ্করাপ্ট। থাকার মধ্যে আছে শুধু এই বাড়িটা।

সণ্টারি উত্তেজিত হয়ে বলে, বাবার কনসালটেন্সি তো ছিল।

—মামা সব খবর নিয়েছে। কনসালটেন্সি ভাল চলত না। অফিসের ভাড়া পর্যন্ত ক্লিয়ার নেই। উই হ্যাভ বিকাম ভেরি পুওর।

তিথি জানে বুক্কা মিথ্যে বলছে না। তার বাবার টাকার নেশা ছিল না, জমাতেও ভালবাসত না। অনেকবার বলেছে. জমাবো, কার জন্য? ছেলেপুলের জন্য? ওরা নিজেরা যদি উপার্জন করতে না শেখে তাহলে ভুগবে। বাপের উপার্জনের ওপর নির্ভর করবে কেন?

বিপ্লব দত্ত টাকা খরচ করত জলের মতো। প্রয়োজনে. অপ্রয়োজনে। বিপ্লব দত্তের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে প্রাচুর্যের মধ্যে। একটার জায়গায় চারটে পোশাক করে দিত বাবা। তাদের প্রত্যেকের পাঁচ সাত জোড়া করে জুতো। ঘরে মেলা আসবাব।

সণ্টারি আতঙ্কের চোখে চেয়ে ছিল ভাইয়ের দিকে, তুই সব শুনেছিস?

—সব। আমার সামনেই তো কথা হয়।

সণ্টারি হাঁটুতে মুখ গুঁজল। বুক্কা একটা অনির্দিষ্ট তাল বাজা‥ টেবিলে। তিথি সামান্য আনমনা হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

থলি থেকে বেড়াল বেরুলো আরও দু মাস বাদে। সোমনাথ এসে এক ঝোড়ো বাদলা-বাতাসের দিনে ওপরের ডাইনিং হল-এ বসল। পরনে একটু ভারী জামাকাপড়। বাইরে ঋতু বদলাচ্ছে। এই বাদলা-বাতাস শীতের আগমনী গাইছে। এবার হয়তো শীতটাও পড়বে জেঁকে।

বেলা এগারোটা। এ সময়টায় রান্না খাওয়া স্নান ইত্যাদির একটা ব্যস্ত সময়। শুধু মিলি দত্তের তেমন কোনও কাজ নেই। বিষণ্ণ মুখে মিলি একটা সাদা সোয়েটার বুনে তুলছে। খুবই সাদামাটা ডিজাইন। বরাবরই মিলি দত্তের এটা একটা প্রিয় কাজ। আসলে শখ। এই শখের জন্য এ-বাড়িতে সকলেরই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি একাধিক সোয়েটার আছে।

—কী রে সোমনাথ, কোথা থেকে এলি ?

—ওফ, অনেক ঘুরেটুরে। শোনো ছোড়দি, ব্যাপারটা হোপলেস।

মিলি দত্ত যেন আরও একটু কুঁকড়ে গিয়ে বলে, কিরকম ?

—এ-বাড়িটার দরুন এখনও অনেক আউটস্ট্যান্ডিং লোন রয়ে গেছে। অফিসেও বিস্তর লায়াবিলিটিজ। তিনটে প্রোজেক্ট মার খেয়ে গেছে। পাওনাদার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। অফিসের ভাড়া চার মাস বাকি।

তুমি কি জানো যে জামাইবাবু অফিসের জন্য একটা কম্পিউটার কিনেছিল ?

—কিছু তো বলত না আমাকে।

—কিনেছিল ! লোকটা কিভাবে টাকা উড়িয়েছিল ভাবো একবার। কোনও মানে হয় মাত্র কয়েক লাখ টাকার টার্নওভারের জন্য একটা কম্পিউটার কেনার ?

মিলি দত্ত শুধু উল বোনা থামিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সেই চেয়ে থাকার কোনও অর্থ নেই !

সোমনাথ দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, কোনও মানে হয় না, একদম মানে হয় না।

—এখন আমরা কি করব ?

—দেনা মেটাতে হলে মিনিমাম তিন চার লাখ টাকা এখনই দরকার। এ ছাড়া তো পথ নেই।

—তার মানে বাড়িটা বিক্রি করতেই হবে ?

—তোমার যা গয়না আছে তা দিয়ে তো হবে না। বাড়ি বিক্রি ছাড়া আর তো পথ দেখছি না।

—সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তিনটে বাচ্চা নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে উঠবো বল তো। সংসারই বা চলবে কি করে ?

—ওঠবার ভাবনা কি ? আপাতত আমাদের কাছে। তারপর দেখা যাবে ধীরে সুস্থে।

মিলি মাথা নাড়ল, ছেলেমেয়েদের তুই চিনিস না। ওরা কোথাও যাবে না। কারও ডিপেন্ডেন্ট হওয়া ওদের ধাতে নেই। বাপের স্বভাব পেয়েছে। ও আইডিয়া ছাড়তে হবে।

—তাহলে কি করবে ? তুমি সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছো তো !

মিলি নিষ্ফল উল আর কাঁটায় ভুল ঘর তুলতে লাগল অন্যমনে। ভ্রূ কোঁচকানো। খুব স্তিমিত গলায় বলল, খুব পারছি। আমি এখন অগাধ জলে, এই তো !

—বলতে গেলে তা-ই।

—এ-বাড়ি বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে ?

—ইট ডিপেন্ডস। দশ থেকে পনেরো লাখ হয়তো।

—তার থেকে দেনা শোধ করলে কত থাকবে আমার হাতে ?

—খুব খারাপ নয়। যা থাকবে হিসেব করে চললে তোমার চলে যাবে। ঠিকমতো ইনভেস্ট করতে পারলে ভালই চলবে। তবে এতটা ভাল নয়।

—এছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই ?

—তোমার আর অ্যাসেট কোথায় ছোড়দি ? কী দিয়ে দেনা শোধ করবে ? শুধু বাড়িটার কথাই বলছি, কেননা বাড়িটা তোমার নামে। জামাইবাবুর নামে হলে সাকসেশন সার্টিফিকেট বের করতে জান বেরিয়ে যেত। আরও গাড্ডায় পড়ে যেতে। তোমার ভাগ্য ভাল, জামাইবাবু বাড়িটা তোমার নামে করেছিল। দি ওনলি ক্লেভার থিং হি এভার ডিড।

মিলি দত্ত হঠাৎ ভাইয়ের দিকে সোজা এবং কঠিন চোখে চেয়ে যেন ঝলসে উঠল, দেনা তো ওর, আমার তো নয়। কিন্তু বাড়িটা আমার। আমি যদি ওর দেনা শোধ করতে না চাই ?

সোমনাথ এবার একটু হাসল, স্বামী-স্ত্রীর অ্যাসেট আলাদা বলেই কি আর পার পাওয়া যায় ? ওটা হয় না। তবু আমি উকিল নিয়ে আসব, কথা বলে দেখো। দেনা যদি শোধ করতে না চাও তাহলেও বিপদ আছে। জামাইবাবু চড়া সুদেই লোন নিয়েছিল। যত দেরি করবে তত সুদ বাড়বে। আমার ধারণা ক্রিমিন্যাল কেস করলে আদালত এ-বাড়ি ক্রোক করবে। পাওনাদাররা খুব সহজ পাত্র তো নয়।

—তারা কারা তা জানিস ?

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, সব জানি না। একটা হাউসিং লোন সোসাইটি আছে। ব্যাঙ্ক আছে।

মিলি দত্ত সোয়েটারে ভুল ঘর তুলে যেতে যেতেই বলে, আমাকে

আর কয়েকটা দিন ভাববার সময় দে। মনে হচ্ছে বাড়িটা বিক্রিই করতে হবে। কত কষ্ট করে করেছিল বাড়িটা। এটা গেলে আমাদের আর কিছুই থাকবে না।

---শোনো ছোড়দি, আমাকে ভিলেন বলে ভাবছো না তো! একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে নিজের বাড়ি কিরকম সেন্টিমেন্টের জিনিস হয় তা কিন্তু আমি জানি। অন্য কোনও পথ খোলা নেই বলে বিক্রির কথা বলছি। ভিলেনের মতো শোনালেও আসলে আমি যা বলছি তা প্র্যাকটিক্যাল। তোমার বাড়ি তুমি বিক্রি করবে কিনা ভেবে দেখো ভাল করে। সময় যত খুশি নাও, কিন্তু সেটা যেন লিমিট ছাড়িয়ে না যায়।

মিলি দত্ত কাঁটা আর উল রেখে দু হাতে মুখ চাপা দিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর যেন আরও গুটিসুটি মেরে ছোটো হয়ে গিয়ে বলে, ছেলেমেয়েদের বলি। ওদেরও তো একটা মতামত আছে।

—ওদের মত একটাই হবে। ওরা এ বাড়ি বিক্রি করা পছন্দ করবে না। যাক গে, তবু ওদেরও বলো। একজন ভাল উকিল ডেকে কথা বলো।

—তুই রাগ করছিস না তো।

সোমনাথ হাসল, না ছোড়দি, রাগ করছি না। তোমার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পারি। শুধু ডিসিশনটা তাড়াতাড়ি নিতে বলছি।

সেদিন বিকেলেও ঝড়জল সমানে চলল। ফোন ডেড়। লোডশেডিং। মিলি দত্ত পাশের মুখার্জি-বাড়ি থেকে একটা ফোন করল বিপ্লব দত্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তরুণী সেনকে। অনেকদিন আগে তরুণী বিপ্লবের বিজনেস প্ল্যানিং করে দিয়েছিল। তরুণী এখন খুব নামজাদা ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার এবং অডিটার। প্রায়ই হিল্লি দিল্লি করে বেড়ায়। মিলির কাছে সব শুনে বলল, হ্যাঁ মিলি, এসব ক্ষেত্রে অ্যাসেট রেখে লাভ নেই। বিপ্লবটা যে আপনাদের ডুবিয়ে দিয়ে গেছে তা আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

করুণ গলায় মিলি বলে, অ্যাসেট বলতে শুধুই তো বাড়িখানা। আর কিছুই তো আমাদের নেই।

তরুণী সান্ত্বনার গলায় বলে, বুঝতে পারছি। তবে সল্ট লেক-এ দোতলা বাড়ি, ভাল দাম পাবেন। সে টাকায় অন্য কোথাও একটা ছোটোখাটো ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েও হাতে বেশ কিছু টাকা থাকবে। চান তো আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মিলি বুঝল, ওই সিদ্ধান্তই একমাত্র খোলা পথ। বাড়ি বিক্রি করা।

রাতে খাওয়ার পর বসবার ঘরে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হল মিলি, শোনো, তোমাদের বাবার অনেক ধারদেনা রয়েছে। আমাদের হাতেও ক্যাশ টাকা বিশেষ নেই। সবাই বলছে বাড়ি বিক্রি করে দিতে।

শুনে কেউ চমকাল না। মনে হয়, ওরা আড়াল থেকে কিছু আঁচ আগেই করেছে। তবে মুখগুলো খুব গম্ভীর আর থমথমে দেখাল। সপ্তর্ষির চোখে টলটল করছে জল। তিনজনের মধ্যে ও-ই সব চেয়ে নরম।

মিলির চোখে জল নেই বটে, কিন্তু তারও কান্না পাথর হয়ে আছে বুকের মধ্যে। শুকনো গলায় মিলি বলল, তোমাদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। কষ্টের জন্য তৈরি হও।

হঠাৎ তিথি বলল, বাবা এই বাড়িতেই মারা গেছে।

মিলি অবাক হয়ে বলে, তাতে কী হল?

তিথি হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন জেগে উঠে বলল, কিছু নয়। জাস্ট সেন্টিমেন্ট।

মিলি অনুত্তেজিত গলায় বলে, আমাদের সেন্টিমেন্ট আর মানায় না। খুবই খারাপ অবস্থায় আমাদের রেখে গেছেন তোমাদের বাবা। এ বাড়ি ছাড়তে আমারও যে কত কষ্ট হবে তা তোমরা বুঝতেই পারছো। কিন্তু উপায় কিছু নেই।

বিপ্লব দত্তের তিন ছেলেমেয়ে কেমন যেন ঘাড় শক্ত করে, কাঠ হয়ে, গোঁজ হয়ে বসে রইল। কেউ কিছু বলল না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, প্রস্তাবটা তাদের মনঃপূত নয়।

মিলির ভিতরটা টনটন করছিল অনেকক্ষণ। ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পিতৃহারা এই তিন অসহায় শিশুর জন্য এবং কে-জানে-আর কোন কারণে হঠাৎ তার দুচোখ ফেটে জল এল। বাড়ি। বাড়ি মানে কি শুধু ইঁট কাঠ পাথর? বাড়ি মানে সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকা নয়? এ-বাড়ি কবেই তাদের আত্মীয় হয়ে গেছে। সঞ্চারি, বুল্কা, তিথি, বিপ্লব যেমন অনেকটা তেমনি। মিলি কাঁদতে লাগল। নিঃশব্দে উঠে চলে গেল তিন ছেলেমেয়ে। তার অদ্ভুত অনাত্মীয় সন্তানেরা।

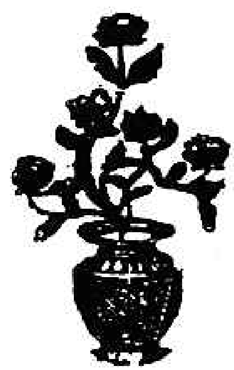

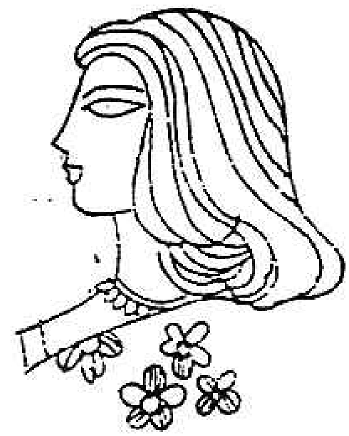

॥ ৪ ॥

বাড়ির হবু খদ্দেররা আসতে শুরু করল ঠিক তিন দিন বাদে। চনচনে শীত আর খরশান রোদ আর শনশনে উত্তুরে হাওয়া এক রবিবারের সকালকে যখন মোহগ্রস্ত করে তুলছে তখন সল্ট লেকের এই নির্জনতর রাস্তায় বাড়ির সামনে একটি নতুন লাল মারুতি এসে থামল। নামল অবাঙালী এক স্বামী আর স্ত্রী। দুজনেই কিছু মোটাসোটা। বয়স ত্রিশের কোঠায়। তাদের পোশাক আর চেহারা দুইই ঐশ্বর্যের আভা বিকিরণ করছিল। যথেষ্ট বিনয়ী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মৃদুভাষী এবং গম্ভীর স্বামী আর স্ত্রীকে ফটকের কাছে রিসিভ করল সোমনাথ। তার মুখে আপ্যায়নের অর্থহীন বিগলিত হাসি।

কোন অজ্ঞাত কারণে ছুটির দিনে আজকাল তিন ভাইবোন একজোট হয় তাদের মৃত বাবার ঘরে। সেখান থেকে তারা তিনটে রন্ধ্রপথে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে থাকে। দুটো জানালায় দুই বোন, দরজায় বুক্কা।

বুক্কাই চাপা গলায় বলে উঠল, ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট!

শুনে ছুটে এল সপ্তর্ষি। তিথি ধীর পায়ে এসে কপাটের পাশে দাঁড়াল।

পুরুষটি বেশ লম্বা, পরনে হাল্কা ক্রিম রঙের সফারি স্যুট।

গায়ে একটু বেশি চর্বি থাকায় বোধহয় লোকটার শীতবোধ কম। এই শীতেও তাই গায়ে কোনও গরম জামা নেই। তবে সফারি স্যুটটা গরম কাপড়ের হতেও পারে। ভুঁড়িটি যথেষ্ট নজরে পড়ার মতো। ভদ্রমহিলার গায়ে একখানা খুব সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করা শাল, যার একটা আঁচল ধুলোয় লুটোচ্ছে। কেউই ব্যগ্র নয় বাড়ি দেখতে। ভঙ্গি কিছুটা ক্যাজুয়্যাল। বড়লোকদের ঠিক এরকমই হওয়ার কথা। বিষয়বস্তু দেখে দেখে তাদের চোখ পাকা এবং উদাস।

বুব্বা বলল, ওরা নিশ্চয়ই বাড়িটা ঘুরে দেখবে!

সপ্তারি বলে, দেখতেই তো এসেছে।

—পছন্দ হবে?

—হবে না! কেমন বাড়ি আমাদের! দক্ষিণ খোলা, এত আলো বাতাস, কতগুলো ঘর, দুটো ব্যালকনি, বাগান! তার ওপর সার্ভেন্টস কোয়ার্টার।

বুব্বা শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে, এভরিথিং এ ম্যান ক্যান ওয়ান্ট ফ্রম এ হাউস। কত দাম দেবে বল তো! ফিফটিন ল্যাকস?

—কে জানে বাবা! অত টাকা জন্মেও দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি বাড়িটা করতে লাখ চারেক টাকা খরচ হয়েছিল।

—তখন টাকার দাম বেশি ছিল। তাই খরচ হয়েছিল কম।

কোকিলটা কি তার শেষ ডাক ডাকছে? উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল তিথি। খুব ডাকছে আজ। গলার রক্ত তুলে ডাকছে যেন।

হঠাৎ বুব্বা তার দিকে ফিরে বলে, মার ঠিক কত টাকা দরকার বল তো!

তিথি ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে।

—আমার পিগি ব্যাঙ্কে কিছু আছে। আর দুটো আংটি। আর টেনিস র‍্যাকেট। তোদের কী আছে? দিদিরও পিগি ব্যাঙ্ক আছে, ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্টও।

—হ্যাঁ। কেন?

—যদি সব আমরা মাকে দিয়ে দিই ?

—তাহলেও হবে না। আমাদের দেনা কয়েক লাখ টাকার।

—ওঃ, কেউ যদি দিত টাকাটা এমনিতেই।

—কে দেবে ? আমাদের কেউ নেই।

সোমনাথের পিছু পিছু আগন্তুক হবু ক্রেতা সস্ত্রীক দোতলায় উঠে গেল।

মান্য অতিথিরা আসবে বলে আজ একটু সেজেগুজে তৈরি ছিল মিলি। পরনে সবুজ সিল্কের শাড়ি, চুল পরিপাটি খোঁপায় বাঁধা, মুখে সামান্য প্রসাধন। গায়ে একখানা সবুজ শাল জড়ানো। আগন্তুক পুরুষটি বোধহয় দেশে ও বিদেশে সুন্দরী মেয়ে অনেক দেখেছে, তবু এই ছোটোখাটো মহিলার প্রখর সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে একটু থমকাল। যেন প্রত্যাশিত ছিল না।

মিলি বাংলাতেই বলে, এই আমাদের বাড়ি। অনেক কষ্ট করে করা। দেখুন যদি পছন্দ হয়।

মিলির গলায় কোনও উৎসাহ নেই, মুখে দীপ্তি নেই। বিষয়ী পুরুষটি তত সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন নয় যে এই সব লক্ষ ও অনুধাবন করবে। এই বাড়ির জড় শরীরে কতখানি ভালবাসা আর মায়া ঢুকে আছে তা বুঝবার মতো বুঝদার কে-ই বা আছে ?

বাসন্তী কফি নিয়ে এল, ঠিক যেমন শেখানো ছিল, ওরা সোফায় বসবার ঠিক দু মিনিটের মাথায়।

লোকটি কম কথার মানুষ। কফির সুদৃশ্য চীনা ডোলের পেয়ালাটির দিকে একবার মাত্র উদাস দৃষ্টিক্ষেপ করে বেশ নরম গলায় বলল, আই নো ইটস এ গুড হাউস। ইউ বিল্ট ইট ফর ইওরসেলফ।

বলে নিজের স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল। তারপর একটু উদাস হয়ে গেল।

সোমনাথ তদ্‌গতভাবে লোকটির মুখপানে চেয়ে ছিল। বলল, ইটস রিয়েলি এ গুড হাউস। অল ফার্স্টক্লাস হ্যান্ডপিকড ফিটিংস।

দোকানদারেরা যেভাবে নিজের জিনিসের গুণ গায় সোমনাথের গলাটা অবিকল সেরকম শোনাল মিলির কানে। মনে মনে সে বিরক্ত হচ্ছে! অস্থির করছে তার বুকটা। অভিমানে ভরে যাচ্ছে সর্ব অঙ্গ। চোখে জল আসছে।

মহিলা উঠল। মুখে বিনম্র হাসি। নাকে হীরের নাকছাবি সামান্য ঝিকিয়ে উঠল। বলল, আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখব?

মিলিকে জড়তা কাটিয়ে উঠতে হল।

মহিলা নিষ্ঠাবতী। পায়ের দামী চপ্পলজোড়া ছেড়ে রেখে বলল, আপনার ঠাকুরঘরটা কোথায়? আগে প্রণাম করব।

—ঠাকুরঘর! মিলি অসহায়ভাবে চারদিকে একবার চেয়ে দেখে বলল, ঠাকুরঘর তো নেই!

মহিলা একটু যেন অবাক হয়ে বলে, ঠাকুরঘর নেই? আপনারা হিন্দু নন?

মিলি তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁ, তবে ঠাকুরঘর তো করা হয়নি।

মহিলা হেসে বলে, নাস্তিক? বাঙালীরা খুব নাস্তিক হয়।

—না। আমরা ঠিক নাস্তিকও নই। আসলে ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

মহিলার মুখশ্রী থেকে বিনয়ের ভাবটা গেল না বটে, তবে যেন একটু হতাশার ভাব যুক্ত হল।

বাড়ি দেখানোর কোনও উৎসাহ ছিল না মিলির। নিঃশব্দে শুধু ঘর থেকে ঘরে, ব্যালকনিতে, ছাদে হেঁটে হেঁটে সঙ্গ দিল। কিছুই ব্যাখ্যা করল না, বাড়ির গুণকীর্তন করল না।

নিচের ঘরে এসে মহিলা বলে, এরা আপনার ছেলেমেয়ে?

তিন গম্ভীর, বিষণ্ণ, শক্ত হয়ে থাকা কিশোর-কিশোরীর দিকে চেয়ে মিলি বলে, হ্যাঁ।

—আর এই ঘরেই তো—?

মিলি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

স্যাড।

ওপরের ঘরে এসে দেখা গেল, সোমনাথ নিচু স্বরে কিছু বলছে। লোকটা আনমনে অবহেলাভরে শুনছে। কফি ছোঁয়নি।

দিদিকে দেখে সোমনাথ উঠে এল। কানের কাছে মুখ এনে সামান্য উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে বলল, দশ লাখ অফার করেছে।

—বাড়ি ভাল করে না দেখেই?

—ওদের জহুরির চোখ। তাছাড়া এ-বাড়ি রাখবে নাকি? দেয়ার উইল বি টোটাল রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিনোভেশনস। ওরা খুব ফাস্টিডিয়াস।

মিলি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। দশ লাখ অনেক টাকা, তবু তার বিমর্ষতা দশ লাখে কাটছে না। কত লাখে কাটবে তা বলা কঠিন।

সোমনাথ গলাটা আরও নামিয়ে বলল, কলকাতায় ওর আরও ছয়খানা বাড়ি আছে। বাড়ি আছে প্যারিস, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক আর সান ফ্রান্সিসকোয়। এ-বাড়ি ফেলেই রাখবে ধরে নিতে পারিস।

—ফেলে রাখবে! খুব অবাক হয়ে বলে মিলি, ফেলে রাখবে কেন?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সামান্য কয়েকটা কথা সেরে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অতি ভদ্র গলায় বলল, নমস্তে জী।

শশব্যস্ত সোমনাথ ওদের এগিয়ে দিতে গেল। বোধহয় ব্যস্ত মানুষটি বেশি সময় দিলে না সোমনাথকে। সোমনাথ মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, ভাল অফার। তাই না?

মিলি সোফায় বসে কিছু ভাবছিল। বলল, ওরা এ-বাড়িতে থাকবে না কেন?

—কটা বাড়িতে থাকবে? বললুম না ছয়খানা বাড়ি আছে! বালিগঞ্জেই দুটো। নিউ আলিপুরে, পার্ক সার্কাসে, শ্যামবাজারে আর আলিপুরে আরও চারটে। এর মধ্যে অবশ্য তিনটে অ্যাপার্টমেন্ট।

শুধু সল্ট লেক-এ ছিল না, তাই কিনছে।

—তাহলে কারা থাকবে এখানে?

—কেয়ারটেকার থাকবে বোধহয়। দুটো ছেলে, দুজনেই আমেরিকায়। স্কুলে পড়ছে।

—তাহলে এক কাজ করুক না কেন, বাড়িটা কিনে নিয়ে ফের আমাদেরই থাকতে দিক। আমরাই কেয়ারটেকার হয়ে যাবো।

সোমনাথ এটাকে রসিকতা হিসেবে নিয়ে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, এ ব্যাপারে ভীষণ কড়া। বলল, দশ লাখ টাকা পেমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই একদম ভ্যাকান্ট বাড়ি চাই। টাকা যখন চাই তখনই দিতে রাজি, কিন্তু বাড়ি ভ্যাকেন্ট করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

—বাঃ, টাকাটা পেয়ে তবে তো আমরা একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট কিনবো, তার আগে যাবো কোথায়? এত জিনিসপত্রেরই বা কি হবে? ওরা সময় দেবে না একটু?

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলে, একটুও না। ওটাই ভদ্রলোকের একমাত্র কন্ডিশন।

—তুই বুঝিয়ে বললি না?

—বলেছি। কিন্তু ভদ্রলোক ওই একটা ব্যাপারে ভীষণ রিজিড।

মিলি চুপ করে রইল। তারপর বলল, বাড়িটা কি সত্যিই ভেঙে ফেলবে বলল?

—সবটা ভাঙবে না। তবে ভাঙচুর কিছু হবেই।

—এত সুন্দর বাড়িটা ভাঙবে?

—হয়তো আরও সুন্দর হবে। তুই ভাবছিস কেন? বাড়ি ছেড়ে দিলে এটা তো আর তোর বাড়ি থাকবে না।

মিলি অবাক হয়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঝাঁঝের গলায় বলে, এটা বরাবর আমার বাড়িই থাকবে। হাতবদল হলেও।

॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় খদ্দের এল পরের রবিবার সকালে। মিলি আগেভাগেই সোমনাথকে বলে রেখেছিল, আমি বাড়ি দেখাতে পারব না। তুই-ই দেখাস। ভদ্রতা যেটুকু করার করব।

প্রথমটায় মিলি তাই মুখোমুখিই হল না খদ্দেরের।

তবে তিন ভাইবোন যথারীতি হাজির তাদের বাবার ঘরে। তারা লক্ষ করছিল কে আসে বাড়ি কিনতে। বুকাই প্রথম দেখে চাপা গলায় বলল, আ গিয়া, হালুয়াওলা আ গিয়া।

দুই বোন বুকার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখতে পেল, একখানা কনটেসা গাড়ি থেকে তিনজন নামল। সঙ্গে এক পেল্লায় সাইজের কুকুর। কুকুরটার অবশ্য শেষ অবধি নেমে পড়া হল না। একটা মেয়ে-গলার ধমক খেয়ে ফের গাড়িতে উঠে গেল। কুকুরটা উঠে যাওয়ার পর নামল চতুর্থ জন। পুরুষ।

চার জনের দুজন মেয়ে, সম্তারির বয়সী। আর তাদের প্রৌঢ় মা বাবা। চারজনই দেখার মতো সুন্দর। টকটক করছে ফর্সা রঙ, বেশ লম্বা এবং মেদহীন চেহারা।

সম্তারি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল, বলল, মেয়ে দুটো নিশ্চয়ই নাচে। কী ফিগার!

বুল্লা নাক কুঁচকে বলে, স্টিংকিং রিচ। নিশ্চয়ই আবুধাবি বা কুয়েত থেকে এদের ইনকাম হয়।

সঞ্চারি বলে, আমেরিকাও হতে পারে।

মামা বলছিল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আমাদের সেকটরে ওদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। সবাই কাছাকাছি থাকবে বলে বাড়ি কিনতে চাইছে। নইলে আগের পার্টির মতো এদেরও কলকাতায় কয়েকটা বাড়ি আছে।

তিথি কোনও কথা বলল না। দাঁতে দাঁত চেপে সামান্য শক্ত হয়ে এক বিদ্রোহী চোখে কনটেসা গাড়িটার দিকে চেয়ে ছিল। গাড়ির ভিতর থেকে অভিজাত কুকুরটা গম্ভীর গলায় একবার ধমকে উঠল—হাউপ্।

চারজন ওপরের ঘরে ঢুকতেই চারজনের সৌন্দর্যে ঘর যেন আলো হয়ে গেল। পোশাকে ছড়ানো বিদেশী সুবাসে ম-ম ম-ম করতে লাগল বাতাস। আজও খুব শীত। দীর্ঘকায় প্রৌঢ়ের গায়ে উটের রঙের একখানা পুলওভার। চুল কাঁচায় পাকায়। কিন্তু শক্ত কাঠামোর পোক্ত চেহারা। মহিলা এদেশী না বিদেশী তা বোঝা যায় না। চুল কালো, চোখের তারা কালো, তবু যেন ভারতীয় ভাবটা নেই। পরনে শাড়ি, গায়ে একখানা কাশ্মীরী গরম কোট। মেয়ে দুজনের বয়স আঠারো উনিশ এবং পিঠোপিঠি। দুজনেই লম্বা এবং চমৎকার জোরালো চেহারা। মেয়ে দুজনের চোখে একটু অবাক চাউনি, চারদিক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখছে। মহিলা একটু অহংকারী মুখ নিয়ে তাচ্ছিল্যের চাউনি হানল এদিক ওদিক। লোকটি খুব ভাবুক মুখে বসে রইল সোফায়। আড়াল থেকে সবই দেখল মিলি। পর্দার সামান্য ফাঁক দিয়ে। চট করে সামনে এল না।

সোমনাথ গদগদ হয়ে বলল, একটু কফি ?

সকলেই প্রায় একযোগে মাথা নেড়ে মানা করল। লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, ওসব দরকার নেই।

মেয়েদের মধ্যে একজন একটু যেন ছেলেমানুষ। ঠ্যাং নাচাচ্ছিল। হঠাৎ সোমনাথের দিকে চেয়ে বলে উঠল, ইজ ইট এ হন্টেড হাউস?

সোমনাথ একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, নো নো, হোয়াই উড ইট বি হন্টেড?

মেয়েটি তার মায়ের চোখের শাসন উপেক্ষা করে বলল, আমি ভূতুড়ে বাড়ি খুব ভালবাসি। কিন্তু কোথাও আসল ভূতুড়ে-বাড়ি দেখিনি।

সোমনাথ কথাটার কী জবাব দেবে ভাবছিল।

লোকটা একটু আগ বাড়িয়ে বলল, আমার ছোটো মেয়ে একটু ইমাজিনেটিভ। কিছু মনে করবেন না। এ বাড়িতে একটা আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছিল শুনেই—। এনিওয়ে আই অ্যাম সরি।

সোমনাথ হেসে বলে, আরে না না, ছেলেমানুষ তো।

লোকটা উঠল, চলুন বাড়িটা দেখি। জুতো খুলতে হবে কি?

সোমনাথ বলে, না না, তার দরকার নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে মিলি ঘরে ঢুকল। আজও তার সামান্য সাজগোজ। মুখ সপ্রতিভ। জোর করে হাসছে। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে হাতজোড় করে একটা নমস্কার করল, কিন্তু কাকে করল তা সে নিজেও জানে না, অন্যরাও বুঝতে পারল না। তবে মিলি এটা বুঝল, সে ঘরে ঢোকামাত্র মহিলার মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। মেয়েদের বিশেষ মেয়েরাই সবার আগে টের পায়।

মিলি যে ছোটোখাটো, মিলি যে তিন ছেলেমেয়ের মা এটা গৌণ হয়ে যায় তার দিকে পুরুষেরা যখন তাকায়। পুরুষটির তীব্র উত্তপ্ত চোখ যে পাগলের মতো তার সর্বাঙ্গে তদন্ত করছে তা টের পেতে তার পুরুষটির দিকে তাকাতেও হল না।

মেয়ে দুটিও তার দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল। ছোটো মেয়েটি হঠাৎ বলেই ফেলল, ওঃ ইউ আর বিউটিফুল!

কামুক পুরুষ আর ঈর্ষাপরায়ণা নারীর চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্যই পিছিয়ে গেল মিলি। অস্ফুট স্বরে বলল, আপনারা

সব দেখে নিন, তারপর কথা হবে।

সোমনাথ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বড়লোক খদ্দেরকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে চলল। ঘর থেকে ঘরে। ছাদে, ব্যালকনিতে। সবশেষে নিচের ঘরে।

লোকটি সর্বপ্রথমেই সঞ্চারিকে লক্ষ করল।

—হার ডটারস অ্যান্ড সন?

—ইয়েস ইয়েস।

সঞ্চারির দিকে চেয়ে লোকটি বলে, তোমার নাম কি?

—সঞ্চারি দত্ত।

—আর তোমাদের?

তিথি তার নাম বলল না। বুক্কা বলল। তিথি টের পেয়েছিল, শুধু সঞ্চারির নামটা জেনে নেওয়াই লোকটার দরকার ছিল। তাদের নাম না জানলেও ওর চলবে।

মহিলা অত্যন্ত কঠিন চোখে সঞ্চারিকে দেখল, কথা বলল না। শুধু ছোটো মেয়েটি তিথির দিকে চেয়ে বলল, অ্যাথলেটিকস?

তিথি মাথা নাড়ল।

মেয়েটি বলল, আমি খুব নাচি, ভরতনাট্যম। এ ঘরটা কার?

—আমার বাবার।

—ও গড! দিস ইজ দা রুম হোয়ার দি ইনসিডেন্ট টুক প্লেস!

তিন ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বুক্কা বলল, হ্যাঁ।

লোকটি সঞ্চারিকে বলে, বাগানটা একটু দেখাবে? চলো না।

সঞ্চারি সাগ্রহে বলল, চলুন।

মহিলা স্বামীর দিকে সাপিনীর চোখে তাকিয়ে ছিল। লোকটা নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে সঞ্চারির একটা হাত ধরে বলল, চলো।

মহিলা তার দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হিন্দিতে যা বলল তার অর্থ বুঝতে তিথির অসুবিধে হল না, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি। নাটক শেষ হোক।

প্রকৃত নাটক শেষ হল আরও দশ মিনিট বাদে। সোমনাথ ওদের

গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে ছুট-পায়ে দোতলায় উঠে বলল, ছোড়দি! বিগ অফার। বারো লাখ। তার চেয়েও ভাল খবর, লোকটা এখনই পেমেন্ট করবে, কিন্তু তোদের আরও এক বছর এ বাড়িতে থাকতে দেবে।

মিলি ফ্যাকাশে মুখে সামনের ঘরে বসে ছিল। স্তিমিত গলায় বলল, থাকতে দেবে? কেন থাকতে দেবে?

—আসলে বোধহয় তোদের অবস্থা শুনে লোকটার সিমপ্যাথি হয়েছে। ভাল লোক।

—অফারটা আমার ভাল লাগছে না।

—কেন বল তো!

—সব তোকে বলা যায় না। ভাল লাগছে না, ব্যস।

বিকেলের দিকে আরও একজন আসবে, কথা আছে। নিচের ঘরে বুক্কা তিথি আর সপ্তারি বসে আছে। বুক্কা বলল, এ লোকটা বাঙালী। এ খুব দর-কষাকষি করবে, দেখিস।

—তোকে কে বলল, বাঙালী। সপ্তারি বিরক্ত হয়ে বলে।

—আমি সব জানি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটেয়। মামা অবশ্য এ লোকটাকে তেমন ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে না।

তিথি তার দাদা ও দিদির কথার মধ্যে নেই। সে শুনছে, বাইরে এই শীতের দুপুরে সেই কোকিলটা হঠাৎ ডেকে উঠল। আর হাওয়া এল উল্টো-পাল্টা। গাছের মরা পাতা, একটা পোড়া গন্ধ আর বিষণ্ণতা নিয়ে হাওয়া ছুটছে এদিক সেদিক।

সিঁড়ির মুখ থেকে বাসন্তী ডাকল, তোমরা খেতে আসবে না? মা আর মামা বসে আছে তোমাদের জন্য।

খাওয়ার কথা তাদের মনেই ছিল না। জিভ কেটে সপ্তারি ছুট লাগাল। পিছন পিছন বুক্কা।

তিথি বসে রইল খানিকক্ষণ।

খাওয়ার টেবিলেই কথাটা তুলল তিথি, আমাদের প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে মা। যে খুশি এসে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে কেন?

সোমনাথ মুর্গীর ঝোল দিয়ে ভাত মাখছিল। বলল, বেশি দিন নয়। আজকের বিকেলটা শুধু। যে তিন পার্টি এনেছি এরাই কেউ প্রসপেকটিভ বায়ার।

—এরা যদি কেউ না কেনে?

সোমনাথ মাথা নাড়ল, কিনবেই। আজ সকালে যে এসেছিল সে হল সিং এন্টারপ্রাইজের মালিক। এক বছর বাড়ি ক্লেম করবে না। আমি তো বলি, ইটস এ ভেরি গুড অফার।

কেন কে জানে মিলির খাওয়া থেমে গেল। বড় টেবিলের এক প্রান্তে বসে সে তার নিরামিষ বিস্বাদ ভাত-তরকারি ফেলে হঠাৎ উঠে গেল। মাছ মাংস বড্ড প্রিয় ছিল মিলির। বিপ্লব দত্ত মারা যাওয়ার পর থেকে সে পাট উঠেছে। মিলির খাবারে এখন কেবলই বিস্বাদ।

মিলির পরেই উঠে গেল তিথি। সে অবশ্য খুব মেপে খায়। ক্যালরি হিসেব করে করে। সেদ্ধ ছাড়া কিছুই খেতে চায় না। সে নিচের ঘরে এসে একা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। হঠাৎ বসে থাকতে থাকতেই তার মাথায় চিড়িক দিল একটা।

নিঃশব্দে সে ফের দোতলায় উঠে এল। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। রান্নাঘরে বসে একা খাচ্ছে বাসন্তী।

—বাসন্তীদি!

বাসন্তী মুখ তুলে বলে, কী বলছো?

—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—কি কথা?

—তুমি সত্যিই বাবাকে দেখতে পাও?

—ও মাগো! আবার ওসব কথা কেন?

—পাও কিনা বলো না!

—স্পষ্ট করে দেখিনি বাবা, তবে দেখেছি।

—ঠিক দেখেছো ?

—ঠিক দেখেছি। ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে এখনও। দেখ না আমার গা।

—তবে আমি দেখতে পাই না কেন ?

—তোমার বুকের পাটা আছে বাপু। ও ঘরটায় একা একা কী করে থাকো ? আমি হলে তো ভয়ে মরে যেতুম। তোমার বাবা এখনও এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। মায়ার টান তো।

তিথি ঘরে এসে অনেকক্ষণ ভাবল। তারা ছেলেবেলা থেকে ভূতটুত মানে না। তবে ভূতের গল্প পড়া বা শোনা—এর একটা মজার দিক আছে। তার বেশি কিছু নয়। আজ সে কি করে বিশ্বাস করবে যে, বাবা এখনও অন্য এক ধরনের অস্তিত্ব নিয়ে আছে ? যদি থাকত তাহলে তিথি ভয় পেত না। বরং তার কিছু উপকার হত।

বিকেলে যে- লোকটা এল সে এল একা। এল বাসরাস্তা থেকে পায়ে হেঁটে। বয়স ত্রিশ বা তার ওপরে। খেটে-খাওয়া মানুষের মতো চেহারা। পোশাকের তেমন পারিপাট্য নেই। ধুতি পাঞ্জাবি চপ্পল। তাকে কেউ অভ্যর্থনা করেনি। ফটকের বাইরে থেকেই উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কে আছেন ?

তিথিই উঠে গেল, কাকে চান ?

—এটা বিপ্লব দত্তের বাড়ি তো !

—হ্যাঁ, এটাই।

—বাড়িতে কুকুর নেই তো !

—না।

—আমার নাম অমিত গুহ। ভিতরে আসতে পারি ?

তিথি বুঝল এ লোকটারই আসবার কথা ছিল। মামার কাছে যেন নামটাও শুনেছে। তিথি লোকটাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যাচ্ছেতাই সব লোক এসে গেছে বাড়ি কিনতে। এ তো পুঁটিমাছ। বুক্কা

ঠিকই বলেছিল, এ খুব দর কষাকষি করবে। শেষ অবধি হালে পানি পাবে না।

তিথি অবহেলাভরে বলল, আপনি দোতলায় উঠে যান। ওখানে আমার মামা আছেন। তিনিই কথা বলবেন।

লোকটার গমনপথের দিকে চেয়ে একটু হাসল তিথি। নার্ভাস, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং অবশ্যই অ্যাডভেঞ্চারাস। নইলে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে যে বাড়ির দর, তার ডাউন পেমেন্টের কথা মাথায় রেখেও বাঙালীটা সাহস পায় কি করে?

ওপরতলাতেও তার অভ্যর্থনা তেমনতরো হল না। সোমনাথ এই প্রথম গম্ভীর মুখে একজন হবু খদ্দেরকে রিসিভ করল। বলল, আসুন।

অমিত গুহর হাবভাব নিতান্তই মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতো। মুখে সংকোচ, দ্বিধা, ভয়মিশ্রিত বিনয়ী একটু হাসি, আত্মবিশ্বাসের অভাব। আগের খদ্দেরদের যে আভিজাত্য এবং দম্ভ মিশ্রিত তাচ্ছিল্য ছিল এর তা তো নেই-ই, বরং যেন অপরাধী ভাব। গরিবরা বড়লোকদের বাড়িতে ঢুকে যেমনটা বোধ করে তেমনই সসংকোচ।

সোমনাথ একটু নিচু নজরেই যুবকটিকে লক্ষ করে বলল, আপনার শীত করে না?

অপ্রতিভ অমিত গুহ একটু হেসে বলে, কলকাতায় আর তেমন শীত কই? গরমজামা আনিনি বলে বলছেন? গায়ে উলিকট আছে। বেশ গরম।

সোমনাথের একটু ভাতঘুম হয়েছে। হাই উঠছিল। বলল, বলুন। বাড়িটা সত্যিই কিনতে চান? দাম কিন্তু অনেক উঠে গেছে। আমরা অপেক্ষা করছি আরও একটু বাড়ার জন্য।

—কত উঠেছে?

সোমনাথ নিঃসংকোচে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল, পনেরো লাখ।

ছেলেটা সোফায় বসে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে

বলল, এরকমই ওঠার কথা। আজকাল কিছু মানুষের পকেটে অঢেল টাকা।

—বাড়িটা কি দেখবেন?

অমিত গুহ মাথা নেড়ে বলে, না না। বাড়ি দেখার দরকার নেই।

—না দেখেই কিনবেন?

অমিত মাথা নেড়ে বলে, না না। তবে এ বাড়ি আমার দেখা।

—দেখা!

—হ্যাঁ। কনস্ট্রাকশনের সময় আমি নিজে সুপারভাইজ করেছিলাম। বি সেন অ্যাসোসিয়েটস এর প্ল্যান করেছিল। প্ল্যানিং-এর ব্লু প্রিন্ট আমার এখনও মনে আছে।

বিস্মিত সোমনাথ বলে, তাই বলুন! তাহলে অবশ্য বাড়িটি আপনার অদেখা বাড়ি নয়। চা খাবেন?

—খাবো। তার আগে একটু জল। ঠান্ডা হলেই ভাল। আমি ঠান্ডা জল খুব ভালোবাসি।

—এই শীতেও?

—আজ্ঞে।

সোমনাথ বাসন্তীকে হুকুম দিয়ে এসে বসল, এ বাড়ি সম্পর্কে আপনার এস্টিমেট কী?

—দর বলছেন? না কি ভ্যালুয়েশন?

—দর। কত হতে পারে এ বাজারে? আপনার লিমিট?

অমিত গুহ মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, ভেবে দেখিনি। তবে খারাপ হবে না। আপনাদের দলিলটা কই?

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলে, দলিলটা বের করা হয়নি এখনও। সার্টিফায়েড কপি আছে।

ছেলেটি মাথা নত করে বসে, যতদূর জানি দলিলটা বের করেছিলেন বিপ্লববাবু।

—তাহলে আছে কোথাও। দলিল নিয়ে ছোড়দির সঙ্গে কথা

বলিনি। ওর কাছেই থাকবে তাহলে। সার্চিং-এর জন্য তো?

—না না। সল্ট লেক-এ সার্চিং-এর দরকার হয় না সেটা আমি জানি। এখানকার জমি বাড়ি আউটরাইট সেল করাও যায় না।

সোমনাথ বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, এসব তো আপনার জানাই।

ট্রেতে এক গেলাস হিমশীতল জল আর চা নিয়ে বাসন্তী ঘরে এল। অমিত সাগ্রহে জলটা নিয়ে ছোটো ছোটো চুমুকে খেতে লাগল। তারপর ঢকঢক করে। চা শেষ করার আগে সে কোনও কথাই বলল না। অনেকটা সময় ভাবুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে চাউনির মধ্যে একটা স্মৃতিচারণের ভাব রয়েছে। যেন অনেক কিছু মনে পড়ছে তার। অমিত গুহের চোখে কিছুক্ষণ পলক পড়ল না।

তারপর সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল, এ বাড়িটা করার সময় বিপ্লববাবুর খুব অর্থকষ্ট যাচ্ছিল। মিলিটারি থেকে আরলি রিটায়ার-মেন্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু হাতে টাকা ছিল না। বোধহয় জানেন উনি সে সময়ে একটা পুরোনো ছোটো কারখানা কিনেছিলেন। অভিজ্ঞতা ছিল না বলে অনেক টাকা নষ্ট হয়, জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, জানি। আমরা জামাইবাবুকে সেজন্য বেশ বকাবকিও করেছি।

—আপনারা হয়তো এটাও জানেন যে, উনি ফিল্ম প্রোডাকশনেও কিছু টাকা ঢেলেছিলেন। সেটাও জলে গিয়েছিল।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, না তো, এটা জানতাম না।

—আমাকে উনি সবই বলতেন। দুঃখের কথা বলার মতো একজোড়া ধৈর্যশীল কান তো আজকাল পাওয়া যায় না। সিমপ্যাথি দেখানোরও দরকার নেই, শুধু শুনলেই মানুষ খুশি হয়, হালকা হয়। আমি শুনতাম। এই বাড়ি তখন তৈরি হচ্ছে। উত্তর দিকে মালপত্র রাখার একটা শেড ছিল। সেখানে একটা বেঞ্চে বসে উনি অনেক কথা বলে যেতেন। হয়তো সেসব কথা ফ্যামিলিতে বলার অসুবিধে ছিল বা

বললেও তা শোনার মতো ধৈর্য কারও ছিল না।

সোমনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, তা কেন? ফ্যামিলির কাছে উনি যথেষ্ট ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন বলেই তো জানি। কিন্তু এসব কথা এখন আর বলেই বা লাভ কি?

অমিত মাথা নেড়ে বলল, না, লাভ নেই। বরং ক্ষতি। আমি শুধু বলতে চাইছি সেসময়ে এরকম একখানা বাড়ি তৈরি করার মতো টাকা ওঁর হাতে ছিল না।

—সেটাও কিন্তু আমাদের অজানা নয়। জামাইবাবু ধার করেছিলেন। কিছু ধার এখনও রয়ে গেছে। বিক্রি করে সেগুলো আমরা শোধ দেবো।

কেমন যেন একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে অমিত বলল, বিক্রি করবেন!

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ, বিক্রি করব বলেই তো আপনি এসেছেন।

অমিত কেমন যেন অসহায় চোখে চেয়ে থেকে বলল, তা জানি। কিন্তু আপনারা আরও একটু ভাবুন।

—কী ভাবব? ভাববার কী আছে বলুন তো! এত বড় বাড়ির ট্যাক্স, মেনটেনেন্স, লোন এত সব মীট আপ করা তো সহজ কথা নয়। জামাইবাবু তো কেটে পড়লেন লাইক এ কাওয়ার্ড। পড়ে রইল শুধু লায়াবিলিটিজ।

খুবই নরম গলায় অমিত বলে, কাওয়ার্ড আমরা সবাই।

চা শেষ করে অমিত তার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলে, যা দাম উঠেছে তা আমার পক্ষে বড্ড হাই। তবে যদি কোনও কারণে বায়াররা না নেয় তাহলে আমাকে একটা খবর দিলে খুশি হবো।

—আপনি তো কোনও দর দিলেন না!

অমিত যেন খুব লজ্জা পেয়ে বলল, সেটা বলতেও লজ্জা পাচ্ছি। পরে দেখা যাবে'খন।

অমিত গুহ বস্তু হঠাৎ উঠে পড়ল। সামান্য ভদ্রতাসূচক কী একটু অস্ফুট গলায় বলে বেরিয়ে গেল।

মিলি শুয়ে ছিল, উঠে এল এ ঘরে। বলল, কে রে লোকটা ?

—পাগল! পাগল! জামাইবাবুর চেনা, এ বাড়ি কনস্ট্রাকশনের সময়ে সুপারভাইজ করত। তুই দেখেছিস কখনও ? নাম অমিত গুহ।

মিলি মাথা নেড়ে বলে, কনস্ট্রাকশনের সময় আমি মাত্র তিন-চারবার এসে দেখে গেছি। ও নামের কাউকে মনে নেই। ও কি বিপ্লবের বন্ধু ?

—না। বয়সের তো অনেক তফাত, বন্ধু হয় কি করে ? তবে ভাব ছিল, ওকে নাকি দুঃখের কথা-টথা বলত। আচ্ছা, তুই কি জানিস জামাইবাবু কখনও ফিল্ম করতে গিয়ে টাকা নষ্ট করেছিল ?

মিলি গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। আমাকে ও কোনও কথা বলত নাকি ? কোনও ব্যাপারে কোনও পরামর্শও নিত না। নিজে যা ভাল বুঝত করত। আমাদের জীবনটা ওই কারণেই তো বিষ হয়ে গেল। কত টাকা নষ্ট করেছে বলল ?

চিন্তিতভাবে সোমনাথ বলে, অ্যামাউন্ট বলেনি। তবে ফিলম ইজ এ বিগ বিজনেস। টাকাটা কম হবে না।

—আর কী বলছিল ?

—ওরিজিন্যাল দলিল আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল। আছে তোর কাছে ?

—না। শুধু সার্টিফায়েড কপি।

—দলিলটা তাহলে কোথায় ?

—যতদূর জানি ওরিজিন্যালটা এখনও আমাদের হাতে আসেনি। ও যেন ওরকমই বলেছিল।

—কিন্তু এ ছোকরা তো বলে গেল দলিল অনেক আগেই জামাইবাবু বের করেছে। তাহলে দলিল গেল কোথায় ? জামাইবাবুর ঘরে নেই তো ?

দাঁতে ঠোঁট চেপে অভিমানে কান্নায় রাঙা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মিলি। আজ কতখানি অপমানিত সে, কতখানি অসহায়। একজন মানুষের সঙ্গে এতদিন ঘর করে, তার ছেলেমেয়ে গর্ভে ধারণ করে, একই ছাদের তলায় বসবাস করেও লোকটার প্রায় কিছুই সে জানে না। লোকটা তাকে জানায়নি। মিলি সহজে কাঁদে না। আজও কান্নার ভঙ্গুর সীমানায় দাঁড়িয়ে টলমল করতে লাগল। ভেঙে পড়ল না শেষ অবধি।

সোমনাথ টয়লেটে গিয়েছিল। ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, খুঁজে দেখিস তো। সল্ট লেক-এর জমির ভেন্ডার হচ্ছে সরকার। দলিল নিয়ে কোনও গন্ডগোল থাকার কথাই নয়।

—ছেলেটা আর কী বলল?

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, আর ওই পুরোনো কথা-টথা বলছিল আর কি। ফ্যামিলিতে জামাইবাবু মনের মানুষ পায়নি, দুঃখের কথা শোনার কেউ ছিল না, এই সব আর কি।

—বাড়ি কিনতে এসে ওসব কথা কেন?

—কে জানে কেন। তবে মনে হচ্ছিল, আরও কিছু বলতে চায়। সেটা শেষ অবধি চেপে গেল। টাকা-ফাকা বিশেষ নেই ছোকরার। শুধু আস্পা আছে। দর শুনে ভয় পেয়েছে মনে হল।

মিলি ভাবছিল অন্য কথা। ওই ছেলেটার কাছে বিপ্লব দত্ত আর কী বলেছে? আর কোন গোপন কথা জানে ওই অমিত গুহ? একজন স্ত্রীর পক্ষে এটা কতখানি অপমানের তা যদি অন্যে বুঝত!

দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরে বড় খাটে সঞ্চারি আর বুকা ঘুমোচ্ছে। বুকা একখানা স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ছিল বোধ হয়, এলানো হাতে সেটা এখনও ধরা। সঞ্চারির নাইটি হাঁটুর ওপর উঠে গেছে। মিলি ম্যাগাজিন সরিয়ে নিল, নাইটি ঠিক করল, তারপর ওদের ঘুমন্ত মুখগুলি দেখল। এগুলো কোনও জরুরী কাজ নয়। মিলি তার সন্তানদের

দিকে চেয়ে ভাবছে, এরা তার কতখানি আপনজন? বিপ্লব দত্তের কিছুটা আর মিলির কিছুটা নিয়ে মিলেমিশে এরা তৈরি। তবু এরা আসলে কার? "আপনজন" কথাটাই এখন ভাবছে মিলি। সন্দেহ হচ্ছে, বিপ্লব দত্তের মতো এরাও তার ঠিক আপনজন নয়।

সোমনাথ সামনের ঘরে সোফায় একটু কেতরে শুয়ে চোখ বুজে আছে। বোধহয় ভাতঘুম।

মিলি ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। তিথি তার বাবার চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছে। ছুটির দুপুরে তিথি ঘুমোয় না।

—কি করছিস?

—মা! এসো। তোমাকে এরকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?

—আমাদের বাড়ির দলিলটা কোথায় জানিস?

—না তো! তোমার কাছে নেই?

—না। তোর বাবা আমাকে যেটা দিয়েছিল তা সার্টিফায়েড কপি।

—তাহলে ওরিজিন্যালটা কোথায়?

—জানি না। এ ঘরে আছে কিনা খুঁজে দেখবি একটু? ডেসকে বা বুক কেসে?

—দেখব মা জমি আর বাড়ির কি দুটো আলাদা দলিল?

—আমি অত জানি না। আমাকে একটা ফাইল দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল। আমি কি ওসব কচকচি বুঝি? যতদূর মনে হয়, দুটো দলিল। তোর বাবা বলেছিল, ওগুলো ওরিজিন্যাল নয়, তবে অ্যাজ গুড অ্যাজ ওরিজিন্যাল।

—একটা লোক এসেছিল একটু আগে। দেখা হয়েছে? অমিত গুহ তার নাম।

—আমার সঙ্গে হয়নি। সোমনাথের সঙ্গে কথা বলে গেছে। সেই ছেলেটাই দলিলের খোঁজ করছিল। সে নাকি তোর বাবাকে চিনত। এ-বাড়ি তৈরির সময়ে নাকি ছেলেটা সুপারভাইজ করত।

তিথি চুপ করে রইল। তার গম্ভীর মুখটার দিকে চেয়ে রইল

মিলি। এ মেয়েটা তার আরও পর। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে তিথির সঙ্গেই তার সম্পর্ক সবচেয়ে আলগা, সবচেয়ে দূরত্বের। তিথি কখনও দুর্ব্যবহার করে না তার সঙ্গে, কথা শোনে এবং ভদ্র ব্যবহারও করে। কিন্তু কোনও উত্তাপ নেই। যেন পাশের বাড়ির মেয়ে। বিপ্লব দত্ত মারা যাওয়ার পর সন্তানদের মধ্যে এই অনাত্মীয়তা বড্ড বেশি টের পায় মিলি। অথচ উল্টোটাই তো হওয়ার কথা! বাবা মারা গেলে সন্তানেরা কি আরও আঁকড়ে ধরে না মাকে?

মিলির একটু কথা কইতে ইচ্ছে করছিল তিথির সঙ্গে। কিন্তু লাভ কী? অতিশয় ভদ্র গলায় এবং শান্তভাবে তিথি তার প্রশ্নের জবাব দেবে, যতটুকু বলার ততটুকুই বলবে, কিন্তু কখনও কোনও আবেগ দেখাবে না।

মিলি তাই ভাবতে ভাবতে ফিরল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে সে কেবল তার ছেলেমেয়ের কথাই ভাবে। বুব্কা ছিল নেই-আঁকড়ে, মায়ের কোল-ঘেঁসা। বাবা চলে যাওয়ার পর সে যেন রাতারাতি সাবালক হল। সপ্তাহ আগে মিলির সঙ্গে বসে সাতকাহন বকত। কলেজের কথা, বান্ধবীদের কথা। আজকাল সে কেন মুখে কুলুপ এঁটেছে?

সোমনাথ পোশাক পরে তৈরি। মিলিকে দেখে বলে, আজ চলি রে ছোড়দি। দলিল-টলিল একটু খুঁজে রাখিস।

মিলি কিছু বলল না। সোমনাথ চলে গেলে সে সেন্টার টেবিলে পড়ে থাকা ভিজিটিং কার্ডটা তুলে দেখল। কী হবে আর এ কার্ডটা দিয়ে? আনমনা মিলি কার্ডটা দু ভাগে ছিঁড়ল। চার ভাগে অবশ্য চেষ্টা করেও ছেঁড়া গেল না। শক্ত জাতের কার্ড। আর মিলিও দুর্বল। ফেলে দিল টেবিলের ওপরেই।

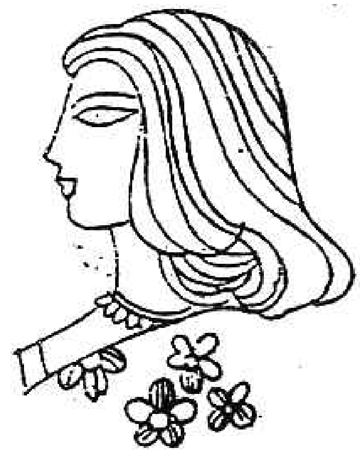

॥ ৬ ॥

তিথির চুয়িং গাম থাকে ফ্রিজে। ঠাণ্ডা চুয়িং গাম মুখে নিয়ে দাঁতে পিষতে পিষতে সে বিকেলে দৌড়োয়।

চারটে বেজে গেছে। তিথি তার ট্র্যাক স্যুট আর দৌড়ের জুতো পরে নিয়ে তর তর করে লঘু পায়ে উঠে এল দোতলায়। ফ্রিজ খুলে চুয়িং গাম বের করে সে মোড়ক খুলল। তিথি খুব ডিসিপ্লিন মানে। কখনও যেখানে সেখানে জিনিস ফেলে না। রান্নাঘরের দরজায় ট্র্যাশবিন রাখা আছে। সেখানে মোড়কের কাগজটা ফেলে সে বেরোনোর সময় দেখতে পেল সেন্টার টেবিলে ছেঁড়া দোমড়ানো কার্ডটা পড়ে আছে। বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল তার। এ-বাড়ির সকলেই একটু অসতর্ক। সে টুকরো দুটো তুলে ট্র্যাশবিনে ফেলতে গিয়েও ফেললনা। অমিত গুহ। টিকটিক! অমিত গুহ! টিকটিক। কিছু একটা মনে পড়ছে। এ লোকটার পরিচয় ছিল বাবার সঙ্গে। এমনও তো হতে পারে····

ট্র্যাক স্যুটের পকেটে টুকরো দুটো ভরে নিয়ে তিথি লঘু পায়ে বেরিয়ে পড়ে।

খোলা আকাশের নিচে চওড়া পথ ধরে ছুটতে কী যে ভাল লাগে তিথির তা বলার নয়। আর দৌড়। দৌড়ের মতো এমন মন-ভোলানো

ব্যাপার আর কিছুই নেই তার কাছে। যখন সে দৌড়োয় তখন বিভোর হয়ে যায়। তার শরীরে গতির জোয়ার বয়ে যেতে থাকে। এক শিহরিত আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। হরেক অ্যাথলেটিকস মীট-এ হাত ভরে প্রাইজ পায় তিথি। দোতলায় একখানা ঘর তার প্রাইজে বোঝাই। কিন্তু প্রাইজটা তার কাছে বড় জিনিস নয়, ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়াও নয়। দৌড়ের মধ্যে যে আনন্দ সে পায় তার তুলনায় প্রাইজ আর কতটুকু?

বিপ্লব দত্ত প্রায়ই বলত, আগের জন্মে তুই বোধহয় হরিণ ছিলি। এত ভাল দৌড়োস কি করে? যখন দৌড়োস তখন ঠিক মনে হয় একটা হরিণ ছুটছে।

এই সব রাস্তায় একসময়ে তার বাবার সঙ্গে দৌড়োতো তিথি। বিপ্লব দত্ত অবশ্য এত জোরে দৌড়োতো না। বয়স, সামান্য মেদজনিত মন্থরতা ছিল। তবু মেয়ের সঙ্গে খানিকটা দৌড়োতে রোজই যেত বাবা। পরনে সাদা শর্টস, গায়ে সাদা টি শার্ট, পায়ে দৌড়ের মোটা সোলের নরম জুতো। আজও তিথির মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা বুঝি একটু পিছনেই আসছে।

সল্ট লেক-এ এখনও বেশ কিছু ফাঁকা জমি। পক্ষীনিবাস, পার্ক, গাছপালা, সবুজ মাঠ, বিশুদ্ধ কুয়াশা, তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এখানে। এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যে কখনও চলে যেতে হবে তা তো ভাবেনি। এখন কোথায় যাবে তারা? কোন গলিঘুঁজির মধ্যে, খুপরি খুপরি ঘরে?

বেলা ডুবে যাচ্ছে দ্রুত। তিথি যেন তার শেষ দৌড় দৌড়োচ্ছে। লম্বা লম্বা পায়ে, জোরালো পদক্ষেপে। ঘন শ্বাস, পেশীতে পেশীতে টানটান ব্যথা। তবু দৌড়োয় তিথি। যতদূর যাওয়ার কথা নয় তত দূর দূর চলে যেতে থাকে। যেন আর ফিরে যাওয়া নেই।

যখন ফিরল তিথি তখন তার শরীর ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে। ট্র্যাক সুট এই শীতেও ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে ঘামে। ঘরে এসে

পোশাক পাল্টে সে ফ্যান চালিয়ে হাওয়ায় বসল কিছুক্ষণ। ট্র্যাক স্যুটের পকেট থেকে কার্ডের টুকরো দুটো বের করে টেবিলের ওপর রেখে, জুড়ে, নাম আর ঠিকানাটা আর একবার দেখল। তার স্মৃতিশক্তি ফটোগ্রাফের মতো তীক্ষ্ন। সবটাই মুখস্থ হয়ে গেছে।

তাদের ফোনটা ডাউন হয়ে আছে বেশ কিছুদিন। অথচ তিথির মনে হচ্ছে লোকটাকে একবার টেলিফোন করা দরকার। পাশের ব্লকে তিথির এক বন্ধু থাকে। ওদের ফোন আছে।

তিথি আবার পোশাক পাল্টে বেরিয়ে পড়ল।

মিনিট দশেক বাদে টেলিফোনে সে সেই গলাটা শুনতে পেল।

—কে বলছেন?

তিথি বলল, আমি বিপ্লব দত্তের ছোটো মেয়ে তিথি। একটা কথা জানতে চাই।

—হ্যাঁ, বলুন।

—আমার বাবাকে আপনি চিনতেন বোধহয়!

—ভালই চিনতাম। একসময়ে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

—আপনি এ-বাড়িটা কিনতে চান কেন?

—কিনতে চাই কে বলল?

—চান না?

লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল, মানেটা সেরকমই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু—

তিথি সামান্য ধৈর্যহারা হয়ে বলে, আপনি কিছু একটা বলতে চাইছেন না! তাই না?

অমিত একটু দোনোমোনো করে বলে, সবটা ঠিক বলবার মতোও নয়। থাকগে।

—দেখুন, আমরা বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছি না। বিক্রি করতে হচ্ছে বলে আমাদের খুব মন খারাপ। কেউ নেই যে, আমাদের এ

ব্যাপারে হেল্প করতে পারে। আপনার যদি কিছু জানা থাকে তাহলে বলে দিন না। প্লীজ!

অমিত গুহ আবার দোনোমোনো করে বলে, বিপ্লববাবু অনেক কষ্ট স্বীকার করে বাড়িটা করেছিলেন। কষ্টটা আমি চোখের সামনে দেখেছি।

—আমরা জানি। বাবাকে লোন নিতে হয়েছিল।

—আপনি তো বোধহয় সেই ছোট্ট মেয়েটি! আমি যখন আজ বিকেলে আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম তখন তো আপনার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল!

—হ্যাঁ। আমাকে তুমি করেই বলুন না। আমি কিন্তু খুব ছোট্ট নই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি খুব ছোট্ট নও মানছি। কিন্তু এই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তুমি কীই বা করতে পারবে? এসব বেশ জটিল ব্যাপার। তোমার মামা তো চিন্তা করছেনই।

—মামা ঠিক আমাদের সেন্টিমেন্ট তো বুঝবে না। এ বাড়িটাকে যে আমরা কত ভালবাসি। মামা শুধু বিপদটা দেখছে। আর বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে চাইছে।

—বিপদ! কি রকম বিপদ তা কি তোমার জানা আছে?

—শুনেছি বাবার অনেক লোন আছে, অনেক পেমেন্ট বাকি আছে। এই সব আর কি। অ্যাসেট বলতে শুধু বাড়িটা।

—বাড়ির জন্য যেসব লোন নেওয়া হয়েছিল তার হিসেব আছে কি!

—আমি অত জানি না।

—তোমরা কি দলিলটা খুঁজে পেয়েছো?

—না। তবে মা আমাকে খুঁজতে বলেছে।

অমিত গুহ একটু চুপ করে থেকে বলল, খুঁজবার দরকার নেই। কারণ ওটা তোমাদের কাছে নেই।

—তবে কার কাছে আছে?

—আছে কারও কাছে।

—আপনি কেন ফ্র্যাঙ্কলি বলছেন না ?

অমিত গুহ একটু দুর্বল গলায় বলল, ওটা আমার কাছে আছে। তবে ওটা কিন্তু আমি চুরি করিনি।

—আপনার কাছে কেন ?

—বিপ্লববাবুই ওটা আমাকে দিয়েছিলেন। মর্টগেজ কাকে বলে জানো ?

—জানি। বাঁধা রাখা তো!

—হ্যাঁ। বিপ্লববাবু একসময়ে ওটা আমার কাছে বাঁধা রেখে টাকা নিয়েছিলেন। ঠিক আমার কাছেও নয়। আমার বাবার কাছে।

—কত টাকা ?

—সে অনেক টাকা।

—আপনাদের কাছে! তাহলে তো বাড়িটা আপনাদেরই হয়ে গেছে।

—ঠিক তা নয়। আমরা তো ক্লেম করিনি।

—এম্মা! তাহলে কী হবে ?

—আমি বলি, তোমার মামা আর কোনও বায়ারকে না ডাকলেই ভাল হয়।

—আপনি মামাকে কিছু বলেননি কেন ?

—আমার খারাপ লাগছিল। তোমরা বাড়িটাকে এত ভালবাসো!

—ভাল তো বাসিই। কিন্তু বাঁধা থাকলে তো কিছু করার নেই।

—শোনো তিথি, এ ব্যাপারটা এখনই কাউকে বলার দরকার নেই। তোমাকে বলে ফেললাম তোমার নার্ভাসনেস দেখে।

—আপনি এখন কী করবেন, বলুন তো! আমরা যদি টাকাটা শোধ দিতে না পারি ?

—আমাদের কোম্পানি সেটা ঠিক করবে। ইট উইল বি এ করপোরেট ডিসিশন। তোমরা হয়তো একটা নোটিশ পাবে। এটা রিমাইন্ডার। প্রথম নোটিশটা বিপ্লববাবুকে মাস ছয়েক আগে দেওয়া হয়েছিল।

—আমরা তো তা জানি না।

—স্থানবার কথাও নয়। উনি নোটিশের জবাবে সময় চেয়েছিলেন। ও'কে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

—কত টাকার লোন বলতে পারেন ?

—লোনটা বড় কথা নয়। ইন্টারেস্টটাই মারাত্মক। যত দেরি হয় তত বাড়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে।

অমিত গুহ যেন মজা করছে এমনভাবে বলল। তিথি চারদিকে চেয়ে দেখে নিল একবার। রাকাদের এই ঘরে কেউ নেই। রাকাদের বাড়িতে এমনিতেই লোক কম। রাকা আর তার মা-বাবা। রাকা পাশের ঘরে পড়ছে। তিথি সুতরাং একা। তবু সে একটু চাপা গলায় বলে, আপনি আজ কেন এসেছিলেন বলুন তো! এলেন তবু কিছুই বলে গেলেন না। আমাদের এখন কী ভীষণ অবস্থা!

অমিত গুহ একটু চিন্তিত স্বরে বলে, আমি ঠিক অফিসিয়ালি যাইনি।

—তাহলে ?

—বাড়িটা বিক্রি হবে এরকম একটা গুজব শুনে আমি কন্ট্যাক্ট করি বায়ার হিসেবে। ইচ্ছে ছিল কত দর দাম উঠছে তা আনঅফিসিয়ালি জেনে নেওয়া। আমাদের কোম্পানি যে লোন রিপেমেন্ট ক্লেম করবে সেটার সঙ্গে বাড়ির দামের কত তফাত হচ্ছে সেটা আঁচ করা। কিন্তু এসব অত্যন্ত কমার্শিয়াল ব্যাপার। তোমার বয়স তো বোধহয় বারো তেরোর বেশি নয়।

—চৌদ্দ প্লাস। এ যুগে চৌদ্দ অনেকটাই বয়স।

—তাই দেখছি।

—একটা কথা বলবেন ? সুদে আসলে কত দাঁড়িয়েছে ?

—সঠিক হিসেব কষা হয়নি। সেটা যাই হোক, ইট ইজ এ ভেরি ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট।

—যদি আমরা আরও একটু সময় চাই, দেবেন ?

—সময় নিয়ে কী করবে ? টাকা শোধ !

—যদি চেষ্টা করি ?

অমিত এ কথায় খুব গলা ছেড়ে অট্টহাসি হেসে উঠতে পারত। হাসিরই কথা। তিথিও টের পাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অমিত হাসল না। বরং খুব সিরিয়াস গলায় বলল, যত সময় নেবে তত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়বে। এই কারবারে টাইম ইজ মানি। ভেবে দেখ। টাকাটা কম হলে সুদ গায়ে লাগে না, কিন্তু বিগ অ্যামাউন্ট মানে সুদও অনেক। পারবে ?

—চেষ্টা করতে দোষ কি ? পার্ট বাই পার্ট যদি দিই ?

—এসব অ্যামাউন্ট পার্ট বাই পার্ট দিয়ে সুবিধে নেই। যা শোধ করবে পরের বছর সুদে আসলে আবার ব্যাক টু দি স্কোয়ার ওয়ান হয়ে যাবে। বাঁদরের অঙ্ক কষোনি, তিন হাত ওঠে তো দু হাত নামে! এখানে তিন হাত উঠলে তিন হাতই নেমে যেতে হবে। লাভ হবে না তিথি।

—তাহলে আমরা কী করব ? বাড়ি বিক্রি করে যদি—?

—বাড়ি বিক্রির প্রশ্ন ওঠে না। ওটা যে বাঁধা আছে। তোমার মামা জানতেন না বলে বিক্রির চেষ্টা করছিলেন।

—আমরা খুব গরিব হয়ে গেছি, তাই না ?

—না, তা কেন ?

—আজও আমাদের বাড়িতে মুর্গীর মাংস হয়েছিল। দু দিন পর থেকেই হয়তো শুধু ডালভাত।

—না, তোমরা এখনও ততদূর গরিব নও। আর একটা কথা হল, বিপ্লববাবুও কিন্তু কখনোই বড়লোক ছিলেন না। তবে উনি বড়লোকদের মতো থাকতে ভালবাসতেন।

—আচ্ছা আপনারা বোধহয় খুব রিচ, তাই না ?

—আমি নই। তবে আমার বাবা-কাকারা ঝানু ব্যবসাদার।

—আপনাদের কি সুদের কারবার ?

অমিত সামান্য হেসে বলে, তা কেন ? আমাদের রোলিং মিল

আছে, স্প্রিং তৈরির কারখানা আছে, ডিস্ট্রিবিউটরশিপ আছে, আবার একটা ফিনানসিয়াল চিট ফান্ডও আছে।

—আমার বাবা কোনওদিন টাকাকে টাকা বলেই মনে করল না। তবু আমি কিন্তু আমার বাবাকে ভীষণ ভালবাসি।

—মনে আছে উনিও তোমার কথাই বেশি বলতেন।

—বলতেন? কি বলতেন?

— তুমি যে বাবাকে ভীষণ ভালবাসো এই কথাটাই বলতেন।

—হ্যাঁ, বাবাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু আমার বাবার কয়েকটা ড্রব্যাক ছিল সেটা অস্বীকার করি না।

—ড্রব্যাক আমাদের সকলেরই আছে।

—আচ্ছা দেউলিয়া বলে একটা কথা আছে না? আমরা কি তাই এখন?

—না, এখনও নও। তোমাদের মস্ত অ্যাসেট ওই বাড়িটা। বিপ্লববাবুর অবশ্য একটা কনসালটেন্সি ছিল। সেটার কী অবস্থা জানি না অবশ্য।

—খুব খারাপ। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। আরও কী কী সব যেন। বোধহয় লায়াবিলিটিজ অনেক বেশি।

—তবু একটু খোঁজ নিতে বোলো তোমার মামাকে কোথাও কোনও বিল ও'র ডিউ হয়েছে কিনা।

—বলব।

—অবশ্য সাকসেশন সার্টিফিকেট না পেলে তোমরা কিছুই ক্লেম করতে পারবে না।

—আচ্ছা, এমন কথাও তো কেউ ভাবতে পারে যে আমার বাবা টাকার প্রবলেমে পড়েই সুইসাইড করেছে।

—ভাবাটাই স্বাভাবিক।

—আর সেই প্রবলেমের জন্য আপনারাও খানিকটা দায়ী!

অমিত সামান্য হাসির শব্দ করল, রাগল না। বলল, আদালত

অবশ্য তা বলবে না। এ হল ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। তবে তোমার কথাটা মর‍্যালি আমি মানছি। বিপ্লববাবু যদি টাকার চিন্তায় আত্মহত্যা করে থাকেন তবে তাতে খানিকটা পরোক্ষ ইন্ধন আমাদেরও ছিল। কিন্তু তুমি এই পয়েন্টটায় বেশি জোর দিও না।

—না, আমি এমনি বললাম। দোষ তো আমার বাবারই।

—তুমি একটা কাজ কোরো। তোমার বাবার ঘরে খুঁজলে কিছু কাগজপত্র পাবে। আমাদের কাছ থেকে উনি যে টাকা নিয়েছিলেন তার কিছু দলিলপত্রের কপি। ওতে আসল টাকা আর রেট অফ ইন্টারেস্ট আছে। বাড়িতে ক্যালকুলেটর থাকলে তাতে হিসেব করে নিতে পারবে। ওঁর লোন-এ প্রতি তিনমাস অন্তর ইন্টারেস্টটা লোন অ্যামাউন্টে যোগ হত, আরও তিন মাস পর সেই অ্যামাউন্টের ওপর সুদ হয়ে সেটা আবার আসলে যোগ হত। বুঝলে?

—ইস্, সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

—খুব সাংঘাতিক। আমাদের কাছ থেকে বড় ব্যবসায়ীরা ডেইলি ইন্টারেস্টেও টাকা নেয়।

—বাবার লোনটা কত দিনের পুরোনো?

—বোধহয় সাড়ে তিন বা চার বছর।

—তাহলে বাবা আপনাদের জন্যই সুইসাইড করেছে।

অমিত একটু ব্যথিত গলায় বলে, পৃথিবীটা দুর্বলদের জায়গা নয়।

—আমার বাবা কিন্তু দুর্বল ছিল না।

—তোমার বাবার কথা বলিনি। আমার কথা বলছি।

—আপনার কথা! আপনার কথা কেন বলছেন?

—কে জানে কেন বলছি। তবে একটা কারণ বোধহয় এই যে, আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। সবটাই আমার হাতের বাইরে।

—বুঝতে পারছি। আপনার সত্যিই কিছু করার নেই। শুনুন, একবারটি আমাদের বাড়িতে আসবেন তাড়াতাড়ি একদিন?

—কেন বলো তো!

—মুখোমুখি একটু কথা বলব।

—লাভ হবে কিছু তাতে?

—হবে না?

—বোধহয় না। আমার বাবা আর কাকাদের চিট ফান্ডের সঙ্গে আমি যুক্ত নই। আমি আলাদা চাকরি করি।

—আমরা কোনও সুবিধে চাইবো না।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সেরকম মেয়েও নয়। আমিও ওসব সুদ-আসলের কারবারে নেই। সত্যি বলতে কি আমি আজ তোমাদের দেখতে গিয়েছিলাম, কোনও সাহায্যে আসতে পারি কিনা সেটাই কনসিডার করতে। কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমাদের জন্য আর কিছুই করার নেই। তবে আমি একবার যাবো। ডেট দিতে পারছি না। তবে হুট করে একদিন—

—আপনি কি খুব ব্যস্ত মানুষ?

—আমি ইরেকশন ইনজিনিয়ার। হিল্লি-দিল্লি করতে হয়।

—বিদেশেও যান?

—প্রায়ই। আমাদের কাজই বাইরে বাইরে।

—কী তৈরি করেন আপনি?

—বেশির ভাগই বাঁধ। পাগলা নদীকে বাঁধি, জলাধার তৈরি করি। একবার এক আরব শেখ নিয়ে গিয়েছিল তার সুইমিং পুল তৈরি করতে। তাও করেছি হাসিমুখে।

—সুইমিং পুল?

—অবাক হওয়ার কিছু নেই। শেখদের অনেক টাকা। তারা বাকিংহাম প্যালেসও কিনতে চেয়েছিল একবার। চৌদ্দ বছরের মেয়ে, তুমি এখনও পৃথিবীর কত কী জানো না!

—হঠাৎ কেন চৌদ্দ বছরের খোঁটা দিলেন বলুন তো!

—ভাবছি তুমি কত ছোটো। পৃথিবী তোমার কাছে কতই না কঠিন

হয়ে উঠছে! তোমার এখন আনন্দের বয়স, ফুর্তির বয়স। এই বয়সে কোনও মেয়ের এরকম সমস্যা আর দুশ্চিন্তায় পড়া উচিত নয়।

তিথি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, বাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব আনন্দ চলে গেছে। টাকা নয়, আরাম বা বিলাসিতাও নয়। বাবাই ছিল আমার আনন্দের সবচেয়ে বড় কারণ।

—বুঝেছি।

—আচ্ছা, আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানেন?

—জানি। কেন?

—আমি জানি না।

—শিখবে?

—খুব তাড়াতাড়ি কি শেখা যায়?

—না। একটু সময় লাগে।

—তাহলে লাভ নেই।

—সব শিক্ষারই একটা বাড়তি সুবিধে আছে। মানিটারি ওয়ার্ল্ডে কখন যে কাকে দরকার হয়।

—চাকরির জন্য নয়।

—তাহলে?

—শুনেছি আমার বাবার অফিসে একটা কম্পিউটার আছে। তাতে বাবা কোন্ ডাটা ভরে রেখেছে তা জানতে ইচ্ছে করে।

খুব অবাক হয়ে অমিত বলে, তোমার বাবার কম্পিউটার ছিল নাকি? জানতাম না তো!

—কম্পিউটারটা এখনও আছে, যদি না বাড়িওয়ালা তালা ভেঙে জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে না থাকে।

—না, তা দেবে না। তাহলে কেস হয়ে যাবে ট্রেসপাসিং-এর জন্য। তোমার ইনফর্মেশনটা নতুন। কম্পিউটারটা আমারও দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কালই আমাকে বোধহয় দুবাই যেতে হবে।

—আপনার কাজটা বেশ, তাই না? আজ এখানে, কাল সেখানে।

—যত মজার বলে মনে হচ্ছে তত মজার নয়, কিন্তু কাজ নিয়ে যাদের ঘুরতে হয় তাদের বেড়ানোটাও হয় কাজের মতো। একবার আফ্রিকায় একটা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে সারাক্ষণ কী করলাম জানো? শুধু ক্যালকুলেট করলাম। কিভাবে জলটাকে বেঁধে একটা বেসিন তৈরি করে চমৎকার একটা হাইডেল-প্রোজেক্ট বানানো যেত! হিসেব কষতে কষতে জলপ্রপাতটার সৌন্দর্য লক্ষই করলাম না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে। বুঝলে?

—বুঝলাম। আপনার সঙ্গে টেলিফোনেই আমার বেশ ভাব হয়ে গেল দেখছি।

—টেলিফোন জিনিসটা অতি চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইকুইপমেন্ট।

—কম্পিউটার তাহলে কাল হচ্ছে না? কবে ফিরবেন?

—দাঁড়াও। আমার যাওয়াটা কিছু অনিশ্চিত। ওখান থেকে একটা ট্র্যাঙ্ক কল বা ফ্যাক্স মেসেজ আসার কথা। এলেই বুঝতে পারব যাওয়ার কতটা দরকার। বিপ্লববাবু হঠাৎ একটা কম্পিউটার কিনলেন কেন জানো?

—না। বোধহয় বড় বিজনেস করবেন বলে।

—আমাদের দেশে কম্পিউটারের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার একটা কায়দা হয়েছে দেখেছো? কথায় কথায় কম্পিউটার দেখাচ্ছে। কম্পিউটারে নাকি প্যাথলজির পরীক্ষা হয়, কম্পিউটারে চোখ পরীক্ষা হয়, কম্পিউটারে ভাগ্যগণনা অবধি হচ্ছে। সব বোগাস! বোঁদা কম্পিউটারগুলো আসলে ডাটা ব্যাঙ্ক। ইনফর্মেশন স্টোর করা ছাড়া আর র‍্যান্ডম অ্যাকসেস দেওয়া ছাড়া কী করতে পারে বলো তো।

—আমি কিন্তু কম্পিউটারের কিছুই জানি না।

—ঠিক আছে, কাল দুবাই গেলেও আমি তো যাবো রাতের প্লেনে। দিনের বেলা একটু সময় করে নেওয়া যাবে। অফিসের চাবি কি তোমাদের কাছে আছে?

—আছে।

—তাহলে আমি কাল সকালে তোমাকে ফোন করব।

—আমাদের ফোন খারাপ। আমি বন্ধুর বাড়ি থেকে ফোন করছি আপনাকে।

—তাহলে ?

—কাল আমার স্কুলও আছে।

—স্কুল কখন ছুটি ?

—সাড়ে চারটে।

—ও কে। স্কুল থেকে সোজা তোমার বাবার অফিসে চলে এসো।

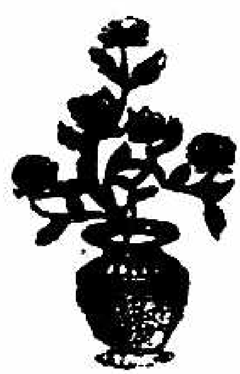

॥ ৭ ॥

বিপ্লব দত্তের ভূত জেগে উঠল মধ্যরাতে। প্রথমে বাতাসের মধ্যে একটু ফিসফাস। তারপর অন্ধকারে একটু মন্থন। আবছা গাঢ় ঘনীভূত হয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠল একটা অস্তিত্ব। শরীর নয়, যেন দীর্ঘশ্বাস আর গভীর অনুভূতি দিয়ে তৈরি এক অস্পষ্ট উদ্ভাস। সে নেই, তবু আছে।

বিপ্লব দত্তের ভূত ছাদ থেকে ধীরে নেমে এল দোতলায়। এক ঘরে তার মেয়ে এবং বাড়ির পরিচারিকা। অন্য ঘরে তার স্ত্রী এবং ছেলে। বিপ্লব দত্ত এক তীব্র আকুলতা নিয়ে লক্ষ্য করল তাদের। ফিসফিস করে বলল, ছিল, ছিল, সব ছিল।

মিলি পাশ ফিরল অস্বস্তিতে। ঘুমের মধ্যে সঞ্চারি বলে উঠল, উঃ মা গো!

বুক্কা মাথা চুলকোলো, একটু ছটফট করল।

বিপ্লব দত্ত ধীরে ভেসে ভেসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে নিচে নেমে এল।

এই তার ঘর। তিথি ঘুমে নিঝুম। বিপ্লব দত্ত চারদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। কিছু অস্থির, উদভ্রান্ত। তার বই, তার চেয়ার, তার বিছানা, চারটে দেয়াল, দক্ষিণের জানালা, সামনের বাগান কিছুই এখন তার আর দরকার হয় না। যখন এক দীর্ঘশ্বাসই যেন বলে

উঠল, ছিল, ছিল, সব ছিল…

ও কি বিপ্লব দত্ত ? না কি এ শুধু তার অস্থিরতা, তার জ্বালা তার উদ্বেগ ও অপূর্ণতারই এক ঝলক !

বিপ্লব দত্তের ভূত বাগানে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাস বলতে লাগল ছিল…নেই…ছিল…নেই…

তিথি আজ প্রথম তার বাবাকে স্বপ্ন দেখল। বাবা যে মারা গেছে এটা তার মনেই হল না। বাবা দিব্যি তরতাজা। ঘরের মধ্যে বাবা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাচ্ছে না। হাঁটকাচ্ছে টেবিল, বইয়ের শেলফ, তাক।

—উঃ বাবা, কী যে করছো ঘরটাকে ! কী খুঁজছো বলবে তো।

—খুঁজছি ! হ্যাঁ, কী যেন।

—কী খুঁজছো তাও জানো না ?

—জানি। কিন্তু কী যে হয় মাঝে মাঝে ! হঠাৎ এইমাত্র ভুলে গেলাম। যেই তুই জিজ্ঞেস করলি অমনি ভুলে গেলাম।

—তোমাকে নিয়ে আর পারি না। এখন অগোছালো ঘর আবার আমাকে গোছাতে হবে। দেখ তো কী কাজ বাড়ালে আমার !

—আহা তোকে কেন গোছাতে হবে। কাল সকালে একাদশী এসে গুছিয়ে দেবে।

একাদশীর কথায় হঠাৎ তিথির একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল, হ্যাঁ বাবা জানো, তোমার সেই সুইসাইড নোটটা পাওয়া গেছে। কী পাগল বলো তো তুমি।

—কোথায় পেলি ?

—তুমি তো ওল্ড পোসামস্ বুক অফ প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস বইটার মধ্যে গুঁজে রেখেছিলে। একাদশী বইটা তুলে রেখেছিল বুক-কেসে। তারপর একদিন…আচ্ছা বাবা, তুমি একটা কী বলো তো ! ওরকম করলে কেন ?

বিপ্লব দত্ত ম্লান একটু হাসল, কী করলাম ?

—সুইসাইড করতে গেলে কেন ?

—ওঃ, সে একটা ব্যাপার আছে।

—সবাই যে তোমার নিন্দে করছে। বলছে লোকটার একদম দায়িত্ববোধ ছিল না।

—ঠিকই বলে রে, ঠিকই বলে। কী যে সব গন্ডগোল পাকিয়ে ফেললাম !

—মায়ের সঙ্গে তোমার বনিবনা হত না, তাই ?

—বউ একটা ফ্যাক্টর। ভীষণ ফ্যাক্টর। বউরা বোঝেই না যে তারা কিভাবে একজন পুরুষকে প্রতিদিনকার নির্দয়তা দিয়ে, শোষণ দিয়ে, অবহেলা দিয়ে মেরে ফেলে।

—ওসব কথা থাক বাবা। জানো তো, তোমাদের দুজনের ঝগড়া হলে আমার কত মন খারাপ হয়।

—আমারও হত। যখন আমার মা-বাবার ঝগড়া হত। উফ, মনে হত, আমি মরে যাই না কেন।

—তাহলেই বোঝো।

বিপ্লব দত্ত মাথা নেড়ে বলে, বুঝি না, কিছু বুঝি না। এই যে বাড়িটা বানাতে এত টাকা ধার করতে হল, ব্যবসা করতে গিয়ে মার খেতে হল, এসব কার জন্য বল তো !

—মায়ের জন্য ?

—একজ্যাক্টলি। আমাকে তিষ্ঠোতে দিত না। কেবল বড়লোক হতে বলত। কেবল···যাকগে, তুই তো পছন্দ করিস না।

—তুমি মরতে গেলে কেন বাবা ! আমার যে সব আনন্দ চলে গেল।

—ভুলে যাবি। সবাই ভোলে। কোনও শোক কি চিরস্থায়ী হয় ?

—আর আমাদের অবস্থাও দেখ। কত গরিব হয়ে গেছি আমরা।

বিপ্লব দত্ত তার চেয়ারে বসে লম্বা চুলে অস্থির আঙুল চালাতে চালাতে বলে, তোমরা কোনওকালে বড়লোক ছিলে না। বড়লোকি করেছো অ্যাট দি কস্ট অফ এ ম্যান। এবার তার গুনোগার দিতে হবে।

—তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা বলতে পারো ?

—পারি। আমি এক নিষ্ঠুরতারই শিকার। দ্যাট বীচ, দ্যাট লিটল উওম্যান····ওফ, আবার বলতে যাচ্ছিলাম।

তিথির চোখ ভরে জল এল।

বিপ্লব দত্ত অস্থিরমতির মতো উঠে ঘর জুড়ে সিংহবিক্রমে পায়চারি করতে করতে বলে, কাঁদিস না। আমি ছেলেমেয়ের চোখের জল সইতে পারি না।

—তুমি আমাদের এত ভালবাসো বাবা, আর মাকে পারলে না ?

—এ কোশ্চেন অফ রেসিপ্রসিটি। যাকগে। আমি ও নিয়ে অনেক ভেবেছি। কার দোষ কে বলবে ? জন্মানোটাই দোষ, বেঁচে থাকাটাই দোষ।

—তাহলে কি আত্মহত্যাই ভাল বাবা ?

—না না। একদম ভাল নয়। আই ফিল লোনলি। ভেরি লোনলি ! কেউ নেই যেন, কিছু নেই যেন, অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা। ঘুম নেই, জেগে ওঠা নেই, খিদে পায় না, তেষ্টা পায় না। বড্ড বোরিং।

—তুমি কেন রোজ আসো না বাবা !

—রোজ আসি। রোজ। তোদের ডিস্টার্ব করি না।

—আমাদের কী হবে বলো তো বাবা ?

—কে জানে ! কত লোক তো আছে। তাদের কী হয় ? অত ভাবিস কেন ?

—আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। বাড়ি বিক্রি হবে।

—বাড়ি ! ইট কাঠ পাথর ! ও দিয়ে কী হয় !

—আমরা যে বাড়িটাকে ভীষণ ভালবাসি বাবা !

—বাড়িকে ! দূর পাগলী, বাড়িকে ভালবাসবি কেন ? মানুষগুলোকে বাস। তবে বাড়িটা বাড়ির মতো হবে। এ-বাড়ির জন্যই না আমার এত লাঞ্ছনা, অপমান, এত কষ্ট, এত····এত····

—বাবা, অত অস্থির হচ্ছো কেন ?

—এ-বাড়িটা···এর জন্য আমাকে নিংড়ে দিতে হয়েছে।····টাকা গেল, প্রেস্টিজ গেল, প্রাণটা অবধি…তিথি!

—কী বাবা?

—সুইসাইড নোটটা কোথায়?

—আমার কাছে আছে। দেবো?

—দে তো।

তিথি নোটটা বের করে দিল।

বিপ্লব দত্ত সেটা পড়ে মাথা নেড়ে বলল কত কথা এখানে লেখা নেই। কত কথা লেখার ছিল! এটা একটা বোগাস জিনিস! আসল সুইসাইড নোট হবে উপন্যাসের মতো বিরাট জিনিস। তাতে সব কথা থাকবে। কি করে একটা লোক অবধারিত মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে তাকে ঠেলে দিচ্ছে কিছু লোক, কিছু কারণ, কিছু পরিস্থিতি। খুব জটিল, বুঝলি?

—বুঝলাম না বাবা। তবে তুমি সুইসাইড করার পর আমারও কয়েকবার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছে।

—দূর পাগলী! তুই কেন মরবি? কোনও মজা নেই।

—মরে তোমার কাছে তো যেতে পারব।

বিপ্লব দত্ত মাথা নাড়ে, না। মরে কেউ কারও কাছে আসতে পারে না। দেখছিস না আমি কেমন একা! বোরিং। অ্যাবসোলিউটলি বোরিং।

ধূপকাঠি নিবে গেলে যেমন গন্ধের রেশ থেকে যায়, মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে বাবার উপস্থিতির একটা রেশ যেন টের পেল তিথি। স্বপ্ন স্বপ্নই। ভূতে সে কখনও বিশ্বাস করেনি। তবু অন্ধকারে সে স্বপ্নটার স্মৃতি উপভোগ করছিল। অন্তত স্বপ্নেও তো এসেছিল বাবা! সে উঠে বাতি জেলে বিপ্লব দত্তের অব্যবহৃত একটা ডায়েরি খুলে তারিখ আর সময়সহ স্বপ্নের একটা বিবরণ লিখে রাখল। স্বপ্নের কথা মনে থাকতে চায় না বলেই লিখল। এ স্বপ্নটা সে ভুলতে চায় না।

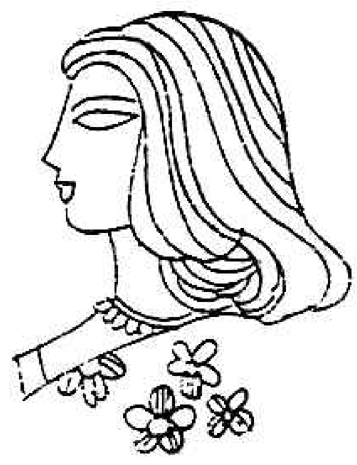

॥ ৮ ॥

সকালে ব্রেকফাস্টের সময় তিথি বলল, মা, আজ আমার স্কুল থেকে ফিরতে অনেকটা দেরি হবে।

—কেন, কোথায় যাবি ?

—বাবার অফিসে। অফিসের চাবিটাও নেবো।

—সেখানে কী আছে ?

—একবার যাবো। দেখব।

—কে নিয়ে যাবে তোকে ?

তিথি একটু হেসে বলে, শোনো মা, এখন কিন্তু আমাদের মাথার ওপরে কেউ নেই। তাই না ? আমাদের কেউ কোথাও নিয়ে যাবে না। এখন থেকে আমাদের একা একাই যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি সাবালকও হয়ে উঠতে হবে। হার্ড ডেজ অ্যাহেড।

মিলি মেয়ের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি এসো। নইলে ভাবব। আজকাল আমার অল্পেই ভীষণ টেনশন হয়।

বিকেলে যখন বিপ্লব দত্তের অফিস-বাড়িতে একাই পৌঁছে গেল তিথি তখন শীতের ঘোর সন্ধে। ল্যান্ডিং-এ একজন স্যুট পরা লোক

দাঁড়িয়ে। বেশভূষার পার্থক্যে লোকটিকে এত অন্যরকম লাগল যে প্রথমে চিনতেই পারেনি তিথি।

—আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করেছি মাত্র। তুমি খুব টাইমলি এসেছো!

তিথি লোকটাকে তখন ভাল করে দেখল, ওঃ আপনি! বাঁচা গেল। একা একটা অচেনা বাড়িতে ঢুকে ভয়-ভয় করছিল। কেউ যদি চোর বলে ভাবে!

—চোরেরা অন্যরকম হয়, তারা তোমার মতো হয় না।

লোকটাকে দেখতে বেশ। একটু যেন নার্ভাস, একটু যেন সরল, আবার যেন মিটমিটে দুষ্টুমি বুদ্ধিও আছে।

বিপ্লব দত্তের অফিস-ঘর খুলে যখন আলো জ্বালাল তিথি তখন চারদিকটা ঝলমল করে উঠল। বোধহয় ভাল ইন্টিরিয়র ডেকরেটরকে দিয়ে সাজিয়েছিল তার অফিস-ঘর বিপ্লব দত্ত। আসল সেগুন কাঠের প্যানেল করা ঘর ক্যাবিনেট, সেগুন কাঠেরই অত্যাধুনিক টেবিল এবং ভাল জাতের গদিওয়ালা চেয়ার।

এয়ারকুলার বসানো ঘরটা একটু ভেপসে আছে। অমিত কুলারটা চালু করে দিল। একদিকে আলাদা কম্পিউটার টেবিল। যন্ত্রটা প্লাস্টিকের ঢাকনা দেওয়া।

অভ্যস্ত দক্ষ হাতে অমিত কম্পিউটার চালু করল। টেবিলের টানায় পাওয়া গেল কম্পিউটারের তথ্যাবলী। অমিত সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে যন্ত্র নিয়ে মেতে গেল। তিথি তার বাবার চেয়ারটায় গিয়ে বসল। লোকটা তাকে এত তাচ্ছিল্য করছে কেন? চৌদ্দ বছর বয়সটা কি এতই তাচ্ছিল্য করার মতো? তার বুঝি বয়স হবে না?

প্রায় আধঘণ্টা একনাগাড়ে একটার পর একটা তথ্য খুঁটিয়ে দেখল অমিত। একটাও কথা বলল না, একবারও ফিরে তাকাল না। লোকটা কাজ-পাগল নাকি?

আধঘণ্টা বাদে অমিত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা বড় শ্বাস

ছাড়ল।

তিথি ব্যগ্র-গলায় বলল, কী দেখলেন?

অমিত ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, কিছু আশাব্যঞ্জক পাওয়া যায়নি এখনও। আরও একটু দেখতে হবে।

—দেখুন, আমি বসছি। আপনার দুবাই যাওয়ার কী হল?

—আজ হচ্ছে না। সাত দিন পর যেতে হবে।

মনে মনে কেন খুশি হল তিথি? এ লোকটা দুবাই না গেলে তার কী এমন উপকার হবে? ভ্রূ কুঁচকে ব্যাপারটা একটু ভাবতে চেষ্টা করল সে। লোকটা আবার কম্পিউটার নিয়ে মগ্ন হয়ে গেছে।

—কাল টেলিফোনে আপনি আমাকে চৌদ্দ বছরের মেয়ে বলে ডেকেছিলেন কেন?

—দাঁড়াও। সামথিং ইজ কামিং আপ।

—আমি কিন্তু আপনার ওপর একটু রেগে আছি।

অমিত কোনও জবাব দিল না। পলকহীন চোখে চেয়ে রইল কম্পিউটারের পর্দার দিকে।

—শুনেছেন! আমি কিন্তু রাগ করেছি।

—এটা একটা আনরিয়ালাইজড বিল দেখছি! সামান্য উত্তপ্ত গলায় বলে অমিত।

—বিল! কিসের বিল!

—তুমি বুঝবে না। একটু চুপ করে বোসো তো!

—ধমকাচ্ছেন! এমনিতেই আমার মন খারাপ।

—প্লীজ! হোল্ড ইওর টাং ফর এ মিনিট। অ্যানাদার বিল। চেক বাউন্স করেছিল। কেস কোর্টে।

—আমাকে কম্পিউটার হ্যান্ডলিং শিখিয়ে দেবেন?

কোনও জবাব পাওয়া গেল না। লোকটার বাহ্য চৈতন্য নেই।

চুপচাপ একটা বন্ধ ঘরে কাঁহাতক বসে থাকবে তিথি। সে হাতের কাছে একটা বেশ ঝকঝকে পুশ বাটন ফোন দেখে বন্ধু রাকাকে ফোন

করল। তরল আলাপ।

—রাকা, বল তো কোথা থেকে ফোন করছি!

—কোত্থেকে রে? বাড়ি?

—পারলি না। বাবার অফিস থেকে। ঘ্যান অফিস।

—ও মা! সেখানে কেন?

—কাজ আছে। আমরা একটা কম্পিউটার বার্স্ট করছি।

—আমরা মানে! তোর সঙ্গে কে?

—একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট। একটু গোমড়ামুখো।

অমিত একটা ধমক দিল, একটু নিচু গলায় কথা বলো। আমি মোটেই গোমড়ামুখো নই।

রাকা সভয়ে বলল, কে রে?

চাপা গলায় তিথি বলে, ওই লোকটা।

—তোকে ধমকাচ্ছে কেন?

—জোরে কথা বলছি বলে।

রাকা খিলখিল করে হাসল, ও বাবা, দারুণ রাগী তো। কম্পিউটারটা কি তোদের?

—ছিল তো আমাদেরই। এখন কী হবে কে জানে। তুই তো ইনসাইড স্টোরি জানিস। শুনেছি বাবার অনেক লায়াবিলিটিজ। কিছুই থাকবে না। কিন্তু আমার বাবার অফিসটা যদি তুই দেখতিস! ফ্যান্টাস্টিক। ছোটোর মধ্যে দারুণ সাজানো, আসবি একদিন?

—গিয়ে কী হবে?

—আরও দুচারজনকে জুটিয়ে দারুণ আড্ডা। ওপাশের ফুটে একটা ভাল রেস্টুরেন্ট আছে। বললেই চা-খাবার সব দিয়ে যাবে।

—এ গুড আইডিয়া!

অমিত ফের মৃদু শাসনের স্বরে বলে, আস্তে। আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হচ্ছে।

—এই রাকা, ছাড়ছি রে। পরে কথা বলব।

—কাল চলে আয় না।

—আচ্ছা দেখব।

—তোর কম্পিউটার এক্সপার্টের বয়স কত রে?

—তা আছে। নিয়ারিং থার্টি।

—ওঃ হেল। আর একটু কম হলে—হ্যান্ডসাম?

—মন্দ নয়। বলেই ফোনটা রেখে দিল তিথি। তার হঠাৎ মেজাজটা খিঁচড়ে যাচ্ছে কেন? কেনই বা বুকটা দুরদুর করছে? তিথি চুপ করে পাথর হয়ে বসে রইল। টিকটিক, টিকটিক, সামথিং রং?

অনেকক্ষণ কম্পিউটারটাকে ব্যবহার করে অমিত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। তারপর একটা ক্লান্তিসূচক শব্দ করল, হাঃ।

তিথি পেছন থেকে ওকে দেখছিল। স্থির চোখে।

অমিত রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে তিথির দিকে তাকিয়ে বলে, লায়বিলিটি আছে, ধারও আছে, বকেয়া আছে অনেক পেমেন্ট। তবু আমি ভাবছি এ কোম্পানি চালু করা যায়।

—কি ভাবে?

—আর মাত্র হাজার পঞ্চাশেক টাকা ঢাললেই। অবশ্য টাকা ঢাললেই হবে না। ইট নীডস এ গুড ম্যানেজমেন্ট। বুদ্ধি আর ধৈর্য থাকলে কোম্পানিকে টেনে তোলা যাবে।

—কে টেনে তুলবে বলুন।

অমিত হাত উল্টে একটা অসহায় ভঙ্গি করে বলে, সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি বুঝবে। ইচ্ছে করলে তুমি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারো, ইচ্ছে করলে নতুন পার্টনার নিতে পারো।

—আমি! আমি কি করে করব?

অমিত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তবে যে বড় চৌদ্দ বছরের মেয়ে বলায় রাগ করছিলে!

—সে তো ঠিকই করেছি। কিন্তু আমি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করব কি করে? কোম্পানি তো বাবার।

অমিত একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি তো এ কোম্পানির একজন পোটেনশিয়াল শেয়ারহোল্ডার অ্যান্ড পার্টনার।

—আমি! সে কী?

অমিত ফের কম্পিউটারের কয়েকটা চাবি টিপল। পর্দায় একটা এগ্রিমেন্টের ছবি ভেসে উঠল। অমিত বলল, এসো, দেখে যাও।

ভীরু, দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল তিথি। পর্দার দিকে চেয়ে সে ছবিটা দেখল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না।

অমিত একটা পেন্সিলের ডগা একটা ডটেড লাইনের ওপর রেখে বলল, এটা তোমার নাম, দেখতে পাচ্ছো?

তিথি দেখতে পেল।

অমিত বলল এ ভেরি লিগালাইজড ডকুমেন্ট। তুমি আর বিপ্লব দত্ত পার্টনার।

তিথি হাঁ করে রইল বিস্ময়ে। বলল বাবা কখনও বলেনি তো আমাকে।

—বলেনি! কিন্তু তোমার সই রয়েছে যে!

—সই! একটু ভেবে তিথি বলল, অনেকদিন আগে বাবা একটা কাগজে সই করতে বলেছিল। সেটাই কি এটা?

—অনেকদিন বলতে তেমন বেশি দিন নয় কিন্তু, মাত্র একবছর আগে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। আমি সত্যিই এই কোম্পানির পার্টনার?

—না, এখন আর পার্টনার নও।

তিথির মুখ শুকনো, এই যে বললেন।

—কী বললাম? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! চৌদ্দ বছরের খুকি, তোমার বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তুমি পার্টনার ছিলে বটে।

—এখন আর নই?

—না। কারণ এখন তুমিই এই কোম্পানির মালিক।

তিথি ঝলসে উঠল, মালিক! ইউ মিন প্রপ্রাইটর?

—হ্যাঁ, তবে এ সিংকিং কোম্পানি। টেনে তোলা যায়, কিন্তু বেশ

কাঠখড় পোড়াতে হবে। খাটুনি আছে।

তিথি চারদিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখল, এসব আমার!

বিরক্ত অমিত বলল, এত উতলা হওয়ার কী আছে? এখন মাথা ঠান্ডা রাখো। আজ বেশ রাত হয়ে গেছে। আজ আর কিছু হবে না। তুমি কাল একটু বেলাবেলি চলে এসো। দরজার গায়ে ওই যে মস্ত লেটারবক্স ওটা খুলে দেখো কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। বিশেষ করে দেখবে চেক। কয়েকটা পেমেন্ট তুমি পেয়ে যাবে। ড্রয়ার, ক্যাবিনেট এগুলোও ভাল করে সার্চ করবে। মনে হচ্ছে কম্পিউটারে আরও ইনফর্মেশন ভরা আছে। সেগুলোও দেখা দরকার।

—কাল আপনি আসবেন না।

—আমি! আমি কেন আসব?

—আমি যে এসব কিছুই বুঝি না।

—বোঝবার কথাও নয়। আমি বলি কি, তুমি তোমার মামার হেল্প নাও।

—মামা তো কেবল সব বেচে দেওয়ার কথা বলে। মামা কিছুতে কোম্পানি চালাতে দেবে না।

—চালানো সহজও নয়।

—তাহলে কী হবে?

অমিত ঘড়ি দেখে বলল, আমার একটা জায়গায় আজ রাতেই যেতে হবে। সময় নেই। এসব নিয়ে পরে কথা হবে।

—পরে মানে কবে?

—এসো, আমার গাড়ি আছে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

—কিন্তু কোম্পানি?

—একটু ভাবতে দাও। বলব।

—দায়িত্ব নিচ্ছেন তো।

—না। দায়িত্ব নয়। আমার ভূমিকা হবে অ্যাডভাইজারের। তার বেশি কিছু নয়।

—বাঃ রে, আমি সবে একটা কোম্পানির মালিক হলাম, আর আপনি আমার উৎসাহে জল ঢেলে দিচ্ছেন।

—আমার তো খুব বেশি কিছু করার নেই তিথি। তবে তুমি ঘাবড়ে যেও না। চেষ্টা করলে পারবে। তোমাদের তিনটে বিল-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ওটা আদায় হলে আপাতত কোম্পানি বেঁচে যাবে। মনে হয় আনরিয়ালাইজড আরও কয়েকটা বিল-এর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তবে আদায় করা শক্ত।

মৌলালি থেকে সল্ট লেক—তিথিকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পথে গাড়ি চালাতে চালাতে খুব কম কথাই বলল অমিত। তাকে ভীষণ গম্ভীর আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। লোকটাকে কেমন ভয়-ভয় লাগছিল তিথির। গতকাল ধুতি পাঞ্জাবি পরা নার্ভাস, কুণ্ঠিত, ভীতু যে লোকটাকে দেখেছিল এ তো সে নয়। পোশাক পালটালে কি লোকের ব্যক্তিত্ব পাল্টে যায়? নাকি এ লোকটা নানা রকম রোল-এ অভিনয় করতে পারে।

লোকটা এমন কি ভাল করে একটা বিদায় সম্ভাষণও জানাল না তিথিকে নামিয়ে দেওয়ার পর। শুধু দায়সারা ভাবে বলল, চলি। এবং চলে গেল।

তিথিকে পাত্তা দিল না। একদম পাত্তা দিল না। আট মাস আগে সে চৌদ্দ পূর্ণ করেছে। বয়স কম নয়। তবু পাত্তা দিল না একদম।

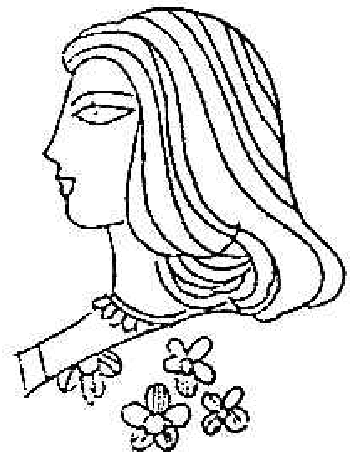

॥ ৯ ॥

রাতে খাওয়ার টেবিলে বুক্কা বলল, তিথি একটা কোম্পানির মালিক, আমাদের এ ঘটনাটা সেলিব্রেট করা উচিত মা।

মিলি তার স্থায়ী কোঁচকানো ভ্রূ তুলে বলে, সেলিব্রেট। আমাদের সেলিব্রেট করার মতো কিছু তো নয়? কে কোম্পানি চালাবে? বাড়িওয়ালা নাকি মামলা করবে। অনেকদিনের ভাড়া বাকি।

সপ্তারি বলল, দেয়ার ইজ হোপ এগেনস্ট হোপ। আমাদের তিন ভাইবোন যদি একসঙ্গে চেষ্টা করি?

মিলি কঠিন চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, আর পড়াশুনো?

বুক্কা বলে, পড়াশুনো করে কী হবে মা? আগে তো আমাদের সারভাইভাল।

মিলি বলে, আমাদের চলে যাবে। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে ঠিক চলে যাবে।

বজ্রাঘাতের ইচ্ছে ছিল না তিথির। কিন্তু তবু কথাটা না বলেও পারল না, বাড়ি বিক্রি হবে না মা। এ বাড়ি মর্টগেজে আছে।

—মর্টগেজ! তোকে কে বলল?

—আছে মা। আমি খবর পেয়েছি। সেইজন্যই ওরিজিন্যাল দলিল আমাদের কাছে নেই।

—তোর বাবা তো কখনও আমাকে বলেনি সে কথা !

—হয়তো তোমাকে দুঃখ দিতে চায়নি। হয়তো ভেবেছিল, টাকা শোধ দিয়ে মর্টগেজ ছাড়িয়ে নেবে।

—উঃ, আর কত ভোগ বাকি আছে বল তো! তাহলে এখন কী হবে ?

—কী হবে তা কেউ জানে না। তিথি একটু চুপ থেকে আস্তে করে বলল, ভাবছো কেন ? কিছু একটা আমরা করবই।

—কী করবি সেটাই জানতে চাইছি।

—জানি না মা। এত তাড়াতাড়ি কি সব ঠিক করে ফেলা যায় ?

—বাড়ি কার কাছে মর্টগেজ আছে তা জানিস ?

—জানি। সেইদিন অমিত গুহ বলে যে ছেলেটি এসেছিল ওদের কাছে।

—তোকে কে বলল ?

—অফিসে রেকর্ড আছে।

—কত টাকার মর্টগেজ ?

—সব তোমাকে বলব মা। এখনও অনেক কিছু দেখতে হবে, জানতে হবে।

বুক্কা বলল, লড়তেও হবে। উই শ্যাল ফাইট।

মিলি চুপ করে রইল। সম্ভবত সে ধূসর চোখে তার দাম্পত্য জীবনটা আগাগোড়া দেখতে চাইছিল। একজন খেয়ালী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, ঢিলা-প্রকৃতির মানুষ। কেন লোকে কবিতা পড়ে তা ভেবে পায় না মিলি। অকাজের কাজ। বিপ্লব কবিতা পড়ত।

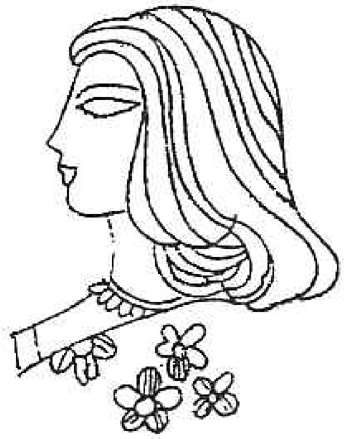

॥ ১৩ ॥

দুবাই! দুবাই! মিডল ইস্ট! পশ্চিম এশিয়া! মরুভূমি! উট! আঙুর! আজান! তেল! টাকা! কেন দুবাই যায় লোকে? এবং ফেরার ঠিক থাকে না?

বাবার অফিসঘরে এসে রোজই বসে তিথি। মাঝে মাঝে তিন ভাইবোন আসে। মামা আসছে। মা আসেছে। কিন্তু কী করতে হবে তা তারা কেউ ভাল বুঝতে পারছে না। ইয়ুল টমসন কোম্পানি অবশ্য একটা চেক দিয়েছে নব্বই হাজার টাকার। গাঁইগুঁই করেনি। আর একটা কোম্পানি বলেছে, সাত দিনের মধ্যে দেবে। বাড়িওলাকে আপাতত ঠেকানো গেছে।

আজ তিথি কম্পিউটার নিয়ে বসে ছিল। তার চোখ ফেটে জল আসছিল। সে কম্পিউটারকে ভেদ করবে কী করে? তাকে তো কেউ শেখায়নি? এ কোম্পানিই বা চালাবে কি করে সে? সে চালানোর জন্য দরকার ইনজিনিয়ার, দরকার ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কো অর্ডিনেশন। তারা সবাই মিলেও মাথামুণ্ডু কিছুই স্থির করতে পারছে না, আর লোকটা দুবাই গিয়ে বসে আছে। রোজ অমিতের বাড়িতে ফোন করছে তিথি আর শুনতে পাচ্ছে, দুবাই! দুবাই! ওই শব্দটাই এখন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। দুবাই যায় কেন লোকে?

একদিন ফোন করতেই একটা মেয়ে ধরল।

—আপনি কি অমিতবাবুর স্ত্রী ?

—স্ত্রী ! অমিতের আবার স্ত্রী হল কবে ?

—মানে আপনি কি ও'র কেউ হন ?

—আমি ওর ছোটো পিসি। আপনি কে ?

—আমি দত্ত রিলায়েনসের একজন পার্টনার। ও কে ভীষণ দরকার।

—কবে ফিরবে ঠিক নেই। এলে খবর দেবো।

ফোন রাখার পর তিথির শুধু খটকা হতে লাগল, অমিতের আবার স্ত্রী হল কবে থেকে ? এ কথাটার মানে কী অমিত গুহ বিয়ে করেনি ! অসম্ভব। নিশ্চয়ই বিয়ে করেছে এবং ছেলেপুলে আছে।

দুদিন পর সে আবার টেলিফোন করল, আচ্ছা অমিতবাবুর স্ত্রী কি বাড়িতে আছেন ?

একটা হেঁড়ে গলা বলে, অমিতের স্ত্রী ! কি সব বলছেন। সে তো বিয়েই করেনি ! আপনি কে বলছেন ?

—আমি দত্ত রিলায়েন্সের পার্টনার তিথি দত্ত !

—ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো প্রায়ই ওকে টেলিফোনে খুঁজছেন। কী দরকার বলুন তো !

—একটা অফিসিয়াল ব্যাপারে ও'র একটু হেল্প—

—আমরা আশা করছি দু চার দিনে এসে যাবে। আপনাকে ও কী হেল্প করছে বলুন তো ! আমি ওর কাকা।

—আমাদের বিজনেসের ব্যাপারে আমি ও'র পরামর্শ নিচ্ছি।

—আপনি কি বিপ্লব দত্তের মেয়ে ?

—হ্যাঁ।

—অ। আপনাদের নামে তো একটা নোটিস যাচ্ছে।

—নোটিশ ! কিসের নোটিশ ?

—একটা লোনের ব্যাপারে !

—হ্যাঁ, জানি।

গত তিন দিন ফোন করেনি তিথি। রোজই অবশ্য তীব্র ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু করেনি। অমিতের বাড়ির লোকেরা তার গলা চিনে ফেলেছে। ফোন করলেই ভাববে আবার ওই মেয়েটা জ্বালাচ্ছে।

তিথি কম্পিউটারের অন্ধকার পর্দার দিকে চেয়ে বসে আছে। ভাবছে। বা কিছুই ভাবছে না। ইচ্ছে করে নয়। মাথার ভিতর দিয়ে হু হু করে এলোমেলো চিন্তারাশি মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে।

দরজায় একটা টোকা পড়ল। বোধহয় বুক্কা বা সঞ্চারি। কিন্তু মনটা টিকটিক করে উঠল, চলকে উঠল। যদি সে হয়!

দরজা খুলে সে দেখল, সে-ই।

কেন যে অভিমানে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল কে জানে! শ্বাস আটকে আসছে, গলা আটকে আসছে, স্খলিত কণ্ঠে সে শুধু বলল, এত দেরি হল কেন?

অমিত অবাক হয়ে তিথির দিকে চেয়ে বলল, আরে! তুমি ওরকম করছো কেন? কাঁদবে নাকি? আরে····

অমিত ভারী বিব্রত হয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে অসহায় ভাব প্রকাশ করল। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, এত জরুরী তলব কিসের জন্য বলো তো! কী এমন বিপদ হল তোমার?

ততক্ষণে তিথি টেবিলে মুখ নামিয়ে হাতের আড়ালে অঝোরে চোখের জল ফেলছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর!

কী মুস্কিল। মেয়েটা কাঁদে কেন? এনিথিং রং?

কোনও জবাব না পেয়ে অগত্যা একটা চেয়ারে বসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল অমিত। সে কাজের মানুষ। মেয়েদের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশই হয় না। এ মেয়েটার নতুন কোনও বিপদ হল নাকি? তাহলে সেটা বলছে না কেন? ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল সে। গলা খাঁকারি দিল বার কয়েক। অস্ফুট স্বরে বার দুই বলে উঠল, "কী মুস্কিল!"

অবশেষে তিথি মুখ তুলল, বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যেমন হয়

চরাচর, তেমনই স্নিগ্ধ সজল মুখ। কান্নার কিছু উপকারের দিকও আছে হয়তো।

অমিত একটু উদ্বেগের গলায় বলে, কী হয়েছে বলবে তো!

—কিছু হয়নি। আপনি এত দেরি করলেন কেন?

অবাক অমিত বলে, আমার তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ছিল নাকি? আর আমার দেরি হল বল্লে তুমি—। ওফ, বাড়িতে না পা দেওয়া মাত্র যার সঙ্গে দেখা হয়-সে-ই বলে, ওরে অমিত, দত্ত রিলায়েন্সের মেয়ে পার্টনার ফোন করেছিল, ভীষণ নাকি জরুরী দরকার? পিসি তো রীতিমতো জেরা শুরু করে দিল, বয়স কত, দেখতে কেমন ইত্যাদি। কী বিপদ বলো তো! রোজ ফোন করতে নাকি?

লজ্জায় মাথা নামিয়ে তিথি বলে, করতাম।

অমিত কী বুঝল কে জানে, তবে হালছাড়া ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে, যাকগে, শোনো। তোমাদের প্রবলেমটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। দেখলাম, তোমাদের পক্ষে দত্ত রিলায়েন্স চালানো অসম্ভব। তোমাদের টেকনিক্যাল নো-হাউ নেই। যদি রাজি থাকো তাহলে আমরা এ কোম্পানিটা কিনে নিতে পারি।

—কিনে নেবেন?

—উইথ অল অ্যাসেটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিজ। এটার বদলে তোমাদের বাড়ির লোনটা ছেড়ে দেওয়া হবে।

অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে তিথি বলে, কী বলছেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমিত বলে, এর জন্য বাবা কাকা জ্যাঠার সঙ্গে তুমুল হয়ে গেছে আমার। তবে শেষ অবধি দে এগ্রিড।

—আমাদের বাড়ি ছাড়তে হবে না তাহলে?

অমিত হাসল, না। তবে তুমিও আর দত্ত রিলায়েন্সের মালিক থাকবে না। ঠিক আছে?

তিথি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক নেই। আপনি দয়া করছেন।

—বেশ পাকা হয়েছো তো। দয়া নয়, দত্ত রিলায়েন্স খুব সিংকিং

কনসার্ন নয়। কম্পিউটারের তথ্য বলছে, কিছু অ্যাসেট এখানে সেখানে আছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট দাঁড়াতেও পারে। এগুলো রিয়ালাইজ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের পাওয়ারফুল অর্গানাইজেশন কর্তৃত্ব হাতে নিলে সেটা অনায়াসে পারবে। কাজেই দয়া বলে ভাববার কিছু নেই। ইটস এ সিম্পল বার্টার।

—আমি একটা নব্বই হাজার টাকার চেক পেয়েছি। কী করব?

—আমরা কোম্পানি পারচেজ করার আগে তুমি যা পাবে তা তোমার। আমরা পুরোনো পেমেন্ট দাবি করব না। সেরকম নিয়ম নেই।

—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। মিথ্যেক। এটাও দয়া।

—মোটেই নয়। অমিত গম্ভীর হয়ে বলে, ইন ফ্যাক্ট আরও দু একটা মোটা পেমেন্ট তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। ব্যাংকে জমা করে দিও। আজ চলি, অনেক কাজ আছে।

অমিত উঠে পড়ল। দরজা খুলল।

তিথি তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে বলল, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইওর মানি।

বিরক্ত অমিত বলে, তাহলে কী চাও?

দাঁতে দাঁত পিষে চৌদ্দ বছরের কিশোরী তিথি তীব্র চাপা স্বরে বলল, আই, ওয়ান্ট ইউ! ইউ! ইউ!

—হোয়াট! বলে প্রকাণ্ড হাঁ করে চেয়ে রইল অমিত।

দরজাটা সজোরে তার মুখের ওপর বন্ধ করে দিল তিথি। তারপর হাসতে লাগল খিলখিল করে একা ঘরে। পর মুহূর্তেই চোখে জল এল।

পাগল! পাগল! সে কি পাগল!

॥ ১১ ॥

বাড়ির টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে দুদিন হল। একটু রাতের দিকে তিথি ফোনটা করল কয়েকদিন পর।

—আমি তিথি।

—মাই গড! চোদ্দ বছরের মেয়ে!

—প্রায় পনেরো। আমি একটা কথা জানতে চাই।

—কী কথা?

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ফর মি?

—আরে পাগল! আমার বয়স কত জানো?

—উইল ইউ বি ওয়েটিং?

—তোমার এটা হল বেড়ে ওঠার বয়স। হাসো, ফূর্তি করো, লেখাপড়া, নাচগান, খেলাধুলো এই সব নিয়ে থাকো। দেখবে ওসব ভাবাবেগ কেটে যাবে।

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ফর মি?

—শোনো তিথি, তোমার সামনে বিচিত্র জীবন পড়ে আছে। লাইফ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং! -- এখনও তো শাড়িও ধরোনি তুমি। কত কী হওয়ার আছে, জানার আছে, পাওয়ার আছে জীবনে।

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ?

—ইয়ে মানে, উঃ, তোমাকে নিয়ে একদম পারা যায় না। খুব দুষ্টু মেয়ে তো !

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ?

—আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। এখন লেখাপড়ায় মন দাও। নাচ শেখো না কেন ? তুমি ভাল দৌড়োও না ? খুব ভাল। দৌড়োও, নাচো, গাও।

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ?

—আচ্ছা মুস্কিল। এটুকু বয়সে এখনই কেন— ?

—উইল ইউ বি ওয়েটিং ?

—আচ্ছা, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।

—ওভাবে নয়। আরও ভাল ভাবে। আবার জিজ্ঞেস করছি, উইল ইউ বি ওয়েটিং ?

অমিত একটু চুপ করে থাকে। তারপর সামান্য নরম গলায় বলে, আই উইল বি ওয়েটিং।